ইসলাম কেন আবেদন হারাচ্ছে?

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সারা দুনিয়াতে ইসলামকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বহু তাত্ত্বিক, চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক দল চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু রাজনৈতিক ও চরমপন্থী আন্দোলনগুলোও শুরুতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত একে একে মুখ থুবড়ে পড়ছে। কোনোভাবেই ইসলামকে আধুনিক মানুষ তাদের জীবনব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করছে না। এ পরিস্থিতির বীজ রোপিত হয়েছে ইতিহাসের ঐ ক্রান্তিলগ্নে যখন মুসলিমরা অসহায় মানুষদের মুক্তির জন্য সামান্য চেষ্টাও করে নি, অথচ তাদের জন্যই দেওয়া হয়েছিল বিশ্বমানবতার মুক্তির লক্ষ্যে। আরবের তৎকালীন স্বার্থপর, পশ্চাৎপদ, পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত আরবজাতিকে শেষ নবী (স.) এমন ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ প্রচণ্ড শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন যে তারা ঝড়ের বেগে ধাবিত হয়ে ২০-২৫ বছরের ব্যবধানে তৎকালীন অর্ধ পৃথিবী জয় করে শান্তি, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করলেন। শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি ইত্যাদি সকল বিষয়ে তারা বিশ্বের শিক্ষকের আসনে আসীন হলেন। পরবর্তীতে তারাই যখন স্থবির হয়ে পড়ল তখন বহু বিকৃতি তাদের মধ্যে দানা বাঁধল এবং তাদের ভেতরেই পতন সৃষ্টি করল। তাদের হাতে সর্বোত্তম জীবনাদর্শ থাকা সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে তারা ইউরোপে ছুটে যায় নি, কৃষ্ণাঙ্গদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে আমেরিকায় যায় নি, জারতন্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে শ্রমজীবী মানুষকে বাঁচাতে রাশিয়ায় ছুটে যায় নি। এ সময়গুলোতে স্থবির অন্তর্মুখী মুসলিমদের আলেম ওলামারা দীনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মাসলা মাসায়েল রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, বিকৃত সুফিবাদীরা ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় রত, আর তাদের সুলতান ও আমিরগণ তাদের হেরেমে সুরা-নারীতে বুঁদ হয়েছিল। প্রকৃতি শূন্যতা রাখে না। মুসলিম জাহানের বাইরে অবশিষ্ট দুনিয়ায় নির্যাতিত নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সঙ্কট মেটাতে জন্ম নিল নতুন নতুন ধর্মহীন দর্শন। ধর্মের যে কাজ অর্থাৎ মানুষের জাগতিক জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা প্রদান সে কাজটি এ জীবনব্যবস্থাগুলো পূর্ণ করে দিল। গণজাগরণ ও বিপ্লব হলো, সুখী সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য কর্মস্পৃহা নিয়ে ধর্মহীন নেতাদের নেতৃত্বে কাজে নামলো মানুষ। তাদের সামনে আর ইসলামসহ কোনো ধর্মেরই মাহাত্ম্য রইল না। তাদের সামনে আব্রাহাম লিংকন, রুশো, নেপোলিয়ন, কার্ল মার্কস, মাও সেতুং-ই উদ্ধারকর্তা মহামানব হিসাবে গৃহীত হয়ে গেল। শেষ রসুলের (সা.) ১৬০ কোটি অনুসারীও আজ তাদের মতাদর্শকেই জাতীয় অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনে ও শিক্ষাব্যবস্থায় মেনে নিয়েছে। বর্তমানে আমরা ইসলামের যে রূপটি দেখতে পাচ্ছি সেগুলো একাধারে জনস্বার্থ, যুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারার সাথে বহুলাংশে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে। সমাজের অর্থনৈতিক অবিচার, সামাজিক অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক, বৈশ্বিক ও সাংস্কৃতিক সংকট, দারিদ্র্য ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে প্রচলিত ইসলামের আলেমদের কোনো বিচরণ নেই। তারা আছেন নারীদের পোশাক কতটুকু ঢিলা হবে, প্রস্রাব পায়খানার আগে ও পরে কী দোয়া পড়তে হবে, কুলুখ ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি কী হবে, টাখনুর কতটা উপরে পাজামা পরতে হবে এগুলো নিয়ে। পূর্ববর্তী যুগের ফকীহ, ইমাম, মুফাসসিরগণ উম্মতে মোহাম্মদীর আরবীয় সংস্কৃতিনির্ভর সমস্ত আচরণকেই ইসলামের মাসলা মাসায়েলের মধ্যে, বিধি-বিধানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, যা সকলের উপর চাপিয়ে দেওয়ার নানামুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তারা নারীদেরকে কার্যত গৃহবন্দী করে রাখার পক্ষপাতী যেখানে পশ্চিমা সভ্যতা মেয়েদেরকে বহু আগে মহাকাশে যাওয়ার সুযোগ পর্যন্ত করে দিয়েছে। এখন বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন মাসলা-মাসায়েল সর্বস্ব ওই বিকৃত ইসলাম এই অগ্রসর যুগের মানুষ কেন মেনে নেবে? উপরন্তু জঙ্গিবাদীরা আল্লাহু আকবার বলে সাধারণ মানুষকে যত্রতত্র জবাই করছেন, মধ্যপ্রাচ্যে মানুষ জবাই করার বীভৎস দৃশ্য অনলাইনে প্রচার করা হচ্ছে যেন তাদের নৃশংসতা দেখে মানুষ ভীত হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের করা দুনিয়াজোড়া অবিচার শোষণ আর অন্যায়ের প্রতিবাদে জঙ্গিবাদীরা এসব করছেন বলে দাবি করা হয়। কিন্তু তাদের এই পথ সঠিক নয়। ওপথে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে না, মুসলিমরাও রক্ষা পাবে না। উপরন্তু ওটা বুমেরাং হচ্ছে। তাদের কারণে কেবল অমুসলিম নয়, মুসলিমদের কাছেও ইসলাম আবেদন হারাচ্ছে। এমতাবস্থায় ইসলামকে যারা আবার গৌরবের অবস্থানে নিয়ে যেতে চান তাদের কী করণীয় সেটাই লেখক এ পুস্তিকাটিতে সরল ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ইসলাম আবেদন হারাচ্ছে কেন?

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
মাননীয় এমাম, হেযবুত তওহীদ

সূচিপত্র

ইসলাম আবেদন হারাচ্ছে কেন? ৩
ধর্মের বিধান সর্বযুগে গ্রহণযোগ্য হতে হবে ২৩
প্রয়োজন আরেকটি রেনেসাঁ ২৮
হুজুগনির্ভর ধর্মোন্মাদনা ইসলামে নেই ৩৩
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী: বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.) ৪৫
মুসলিমদের কেন অভিশপ্ত জনগোষ্ঠীর পরিণতি হলো? ৫০
রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে কি আলাদা রাখা সম্ভব ৬২

প্রকাশক:
তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড,
পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১
www.hezbuttawheed.org
ফেসবুক পেইজ:
আসুন সিস্টেমটাকে পাল্টাই; Let's change the system
জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই; Ideological War on Terrorism
প্রকাশকাল: ২৫ এপ্রিল ২০১৭
ISBN: 978-984-34-2474-7

মূল্য: ৬০.০০ টাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম আবেদন হারাচ্ছে কেন?

আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, আরব, ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া ও ভারত উপমহাদেশের অনেক আলেম, তাত্ত্বিক, ইসলামী চিন্তাবিদ গত শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে নিজেদের পছন্দনীয় ইসলামের উত্থান ঘটানোর জন্য বিভিন্ন সংগঠন ও আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু সফল হন নি। এর মধ্যে কোনোটি গণতান্ত্রিক ধারার রাজনৈতিক আন্দোলন, কোনোটি চরমপন্থী। রাজনৈতিক ধারার আন্দোলনগুলো শুরুতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও বর্তমান সময়ে এসে সেগুলো একে একে মুখ থুবড়ে পড়ছে, জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের এই যে ব্যর্থতা এর প্রকৃত কারণ কী?

এর কারণ উদ্ঘাটন করতে হলে আমাদেরকে উম্মতে মোহাম্মদীর উত্থান ও পতনের ইতিহাসটি ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে। কেন এই জাতিটিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, কোন গুণের দ্বারা তারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল আবার কেনই বা তারা আজ অন্য জাতির গোলাম, ইতিহাসের কোন বাঁকে আমরা পথ হারিয়েছি - এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর সঠিক মূল্যায়নের ব্যর্থতাই জাতির প্রতিটি পদক্ষেপকে আজও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করছে। তারা ভুলে গিয়েছিল যে কেয়ামত অবধি তাদের সমকালীন বর্বরতার উচ্ছেদই উম্মতে মোহাম্মদীর অস্তিত্বের লক্ষ্য।

সমকালীন বর্বরতার উচ্ছেদঃ

ইসলাম ও রসুলাল্লাহর (সা.) জীবনের লক্ষ্যকে অনুধাবন করতে হলে সে সময়ের আরবসহ অন্যান্য এলাকার সমাজচিত্র সম্পর্কে ধারণা রাখা আবশ্যক। আরব অর্থাৎ যে অঞ্চলে আল্লাহর রসুল এসেছিলেন সেখানকার সার্বিক অবস্থা তথা সামাজিক অবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদি অবস্থাগুলো অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। হিট্টি সেই আরবদেরকে বলেছেন **"একটি সম্ভাবনাহীন জাতি"**। তখন পৃথিবীতে বড় বড় দুটো সভ্যতা, দুটো সুপার পাওয়ার। একদিকে রোমান, আরেকদিকে পার্সিয়ান। আর মধ্যখানে উশর মরুভূমি আরব - অবজ্ঞাত, অবহেলিত, উপেক্ষিত, অশিক্ষিত। নামমাত্র অল্প কিছু লোক বংশ পরম্পরায় কাসিদা-কবিতা পাঠ করতো, তাও অশ্লীলতায় ভরপুর। তারা ছিল কুসংস্কারের আচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট কোনো জীবনব্যবস্থা ছিলই না, গোত্রপতিদের যখন যা খেয়াল হতো সেটাই আইন। ভূত-প্রেত, মূর্তি সমস্ত কল্পিত বিষয় নিয়ে তারা মত্ত ছিল।

সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল সেটা সবাই জানে। সমগ্র আরবে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজমান ছিল। ব্যাপকভাবে সর্বত্র অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, আত্মকলহ, হত্যা, রক্তপাত অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকত। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে গোত্রগুলোর মধ্যে শত শত বছর বংশানুক্রমে যুদ্ধ চলত। **আরবের অধিকাংশ গোত্রই লুটতরাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। লুটতরাজ কোনো দোষের কাজ বলে গণ্য হতো না।** প্রত্যেক গোত্রই অপর গোত্রের ধন-সম্পদ, গৃহপালিত পশু এমন কি স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যেত এবং বাঁদি-দাসীরূপে বিক্রি করে অর্থোপার্জন

করত। কোনো ব্যবসায়ীদল নিরাপদে কোনো পথ অতিক্রম করতে হলে সেখানকার ডাকাতদেরকে উপযুক্ত ভেট দিতে হতো।

আর্থিক অনটনের দরুন চুরির প্রসারও কম ছিল না। এই বিদ্যায় প্রায় সকল লোকই ছিল সুপণ্ডিত। এজন্যই ইসলাম গ্রহণ করতে আসলে রসুলাল্লাহ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকে চুরি না করার অঙ্গীকার নিতেন। সর্বদা মারামারি, কাটাকাটি, চুরি, ডাকাতিতে লিপ্ত থাকার দরুন তাদের অন্তরে মায়া মমতার লেশ মাত্রও ছিল না। তারা ছিল মানবাকৃতির হিংস্র প্রাণী।

ব্যভিচার অনাচার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, **প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার করাকে ইতরামি মনে করা হলেও গোপনে ব্যভিচার করাকে তারা দোষ মনে করত না। যদিও গুপ্তভাবে ব্যভিচার করা হতো কিন্তু ধর্ষণের পর প্রকাশ্য সভায় স্বীয় বদমায়েশী ও গুণ্ডামির কাহিনী বর্ণনা করাকে গৌরব মনে করত।** মক্কা নগরীতেও পতিতা নারীর কোনো অভাব ছিল না। তারা ঘরের সামনে পতাকা টানিয়ে রাখতো। পুরুষরা তাদের দাসীদেরকে বলপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি করে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য করত। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, স্বীয় দাসীদিগকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বল প্রয়োগ করো না (সুরা নূর-৩৩)। আরবদের লজ্জা বলতে কোনো বস্তু ছিল না। কোরায়েশরা ছাড়া আর সকলেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উলঙ্গ অবস্থায় কাবা তওয়াফ করত।

নারীদের দুর্দশার সীমা ছিল না। তারা পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতো না। যুদ্ধে জয়লাভ করলে বিজয়ীগণ বিজিতপক্ষের নারীদের উপর খোলাখুলিভাবে যুদ্ধের ময়দানেই পাশবিক অত্যাচার করে স্বীয় ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করত। পুরুষের বিবাহের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। যার যত ইচ্ছা বিয়ে করতে পারত। পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত বিমাতারা পুত্রের স্ত্রীতে পরিণত হতো। মেয়েদের জন্মগ্রহণ করাই যেন ছিল পাপ। যত অবিচার, অত্যাচার ও উৎপীড়ন সবই তাদের ভোগ করতে হতো। মানুষ মেয়েদেরকে কলঙ্ক ও অপমানের উৎস বলে মনে করত। এমন কি মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে জীবিত মেয়েকে মাটির নিচে প্রোথিত করা হতো। এই মর্মান্তিক জঘন্য প্রথা সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তখন পৃথিবীতে পারস্য ও রোম এই দুইটি সাম্রাজ্যই ছিল প্রবল পরাক্রমশালী। সব সভ্যতারই একটি স্বর্ণযুগ থাকে, এক কালে পারস্যের সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু মহানবীর (সা.) আবির্ভাবের দেড়শত বছর পূর্ব থেকেই এই রাজ্য দ্রুতগতিতে অবনতির দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। ধারাবাহিক রাষ্ট্রবিপ্লব, আমির ওমরার বিলাসপ্রিয়তা এবং প্রজাদের উপর রাষ্ট্রশক্তির অমানুষিক অত্যাচারে এই রাজ্য ধ্বংসন্মুখ হয়ে পড়েছিল।

মানুষের নৈতিক চরিত্র তখন এত নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে পিতা কন্যাকে বিয়ে করা এবং ভাই আপন বোনকে বিয়ে করা তাদের দৃষ্টিতে কোনো অন্যায় কাজ ছিল না। সম্রাট ইয়াজদেগরদ নিজের ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করে তাকে হত্যা করেছিলেন। সেই সময় রাজ ও রাজপ্রতিনিধিরা শ্রেণিভেদে প্রজাদের উপাস্য ছিল। প্রজারা

তাদেরকে সেজদা করত। তাদের দরবারে কারও বসবার বা মুখ খোলার অধিকার অধিকার ছিল না। কোনো অপরাধের জন্যই তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হতো না। এমন মতবাদ সেই সমাজে চালু হয়েছিল যে রমনী ও ধন-সম্পদ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এতে সমভাবে সকলের সমান অধিকার আছে। ইতর-অভিজাত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষই এই প্রথাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। এই প্রথা সরকারিভাবেও সমর্থিত হয়েছিল। স্বয়ং সম্রাট কোবাদ এই জঘন্য মতবাদের প্রচারে অগ্রনায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিণতিতে সারা দেশ ভোগ বিলাস এবং কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল।

৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে নওশেরওয়ার মৃত্যুর পর ইরান রাজ্য চতুর্থ হরমুজের করায়ত্ব হয়। তার রাজত্বকালে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, আত্মকলহ, রাজকর্মচারীদের অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতা এবং সর্বসাধারণের চারিত্রিক অবনতি অনবরত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে পুরো সমাজ জঘন্য সব অপরাধ, অবিচার, অনাচার কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবশেষে ৬৩৬ সনে মুসলিমদের হাতে শত শত বছরের প্রজ্জ্বলিত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির আগুন নির্বাপিত হয়। রোমের অবস্থাও পারস্যের চেয়ে ভালো ছিল না। সারা দেশ অনাচার, অত্যাচার, ধর্ম সংক্রান্ত মতানৈক্য, রাজনৈতিক আত্মকলহ এবং দলাদলির দাবানলে দগ্ধ হয়ে দ্রুতগতিতে অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল।

রোমকদের রাজত্বে দাসপ্রথা বর্বরতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারা ছিল নিছক পণ্য সামগ্রী। অধিকার বলতে তাদের কিছুই ছিল না। অথচ তাদের পালন করতে হতো দুঃসহ ও কঠিনতম দায়িত্ব। **এই দাসেরা আসত কোত্থেকে? এর সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল যুদ্ধ। আনন্দ, যৌন ব্যভিচার ও বিলাস-ব্যসনের উপায়-উপাদান হাসিল করার জন্যেই তারা বাইরের এলাকাসমূহ আক্রমণ করত এবং সেখানকার নারী-পুরুষদেরকে গোলাম বানিয়ে তাদের ভয়ঙ্কর পশুপ্রবৃত্তির চরিতার্থ করত।** রোমকরা এই সকল যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও সুখ-ঐশ্বর্যের দ্রব্য সামগ্রী, ঠাণ্ডা ও গরম গোছলখানা ও বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ, মজাদার পানাহার ও আমোদ-প্রমোদের পথ প্রশস্ত করত। পতিতাবৃত্তি, মদ্যপান, নাচ-গান, ক্রীড়া-কৌতুক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া তারা যেন চলতে পারত না।

ভারতবর্ষের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বর্ণভেদ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে শত শত বছর ধরে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা চলছিল, দমন পীড়নের জন্য ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা একে অপরের বিরুদ্ধে আইন আর ধর্মীয় ফতোয়া বান নিক্ষেপ করছিল। এর বলি হয়ে চলছিল নিম্নবর্গের মানুষগুলো। উচ্চ বর্ণের পুরুষ নিম্ন বর্ণের রমণীর সাথে ব্যভিচার করা কোনো অপরাধ ছিল না। যদি অস্পৃশ্য জাতির কোনো ব্যক্তি উচ্চ জাতির কাউকে প্রহার করে, তবে এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ যে অঙ্গ দিয়ে প্রহার করেছিল সেই অঙ্গ কেটে ফেলতে হতো। গালি দিলে জিহ্বা কেটে ফেলতে হতো। শুদ্রদের জন্য ধর্মগ্রন্থ বেদ পাঠ করা তো দূরের কথা, বেদমন্ত্র শ্রবণ করলেও উত্তপ্ত গলিত সীসা কানে

ঢেলে তাদেরকে বধ করা হতো। নারীদেরকে পুরুষের দাসীরূপেই গণ্য করা হতো। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। রসুলাল্লাহ যখন আবির্ভূত হন তখন বাকি পৃথিবীতে মানুষ কেমন দুর্দশাগ্রস্ত ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তাই যেটুকু উল্লেখ না করলে মূল বিষয়বস্তুর ভাব ও তাৎপর্য বোঝা অসুবিধাজনক হবে, সেটুকুই করলাম।

কথা হচ্ছে, এই যে **বিশ্বময় মানবতার বিপর্যয় চলছিল, অপরাধ পাপ, ধর্মের নামে অধর্ম, শোষণ, শাসকের অবিচার, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা- এই কালো অধ্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যই আল্লাহ শেষ রসুল ও শেষ কেতাব প্রেরণ করেছিলেন।** তিনি সারাটি জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম আর অটল অধ্যবসায়ের মাধ্যমে, কঠিন প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি জাতি সৃষ্টি করলেন যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী। এদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন সমগ্র পৃথিবীতে যেখানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত সেখানেই তারা যাবে এবং মানুষকে শান্তি দেবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই কিছুদিন আগে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে এগারো কোটি মানুষ নিহত হওয়ার পর, বহু নগর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর, কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা উদ্বাস্তু হওয়ার পর বিশ্বের জাতিগুলো উপলব্ধি করেছিল যে এমন একটি বাহিনী লাগবে, সংগঠন লাগবে যারা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এ লক্ষ্যে তারা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করল যার মধ্যে শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলোকেও রক্ষার জন্য আলাদা আলাদা সংস্থা করল। এটা সেদিনের ঘটনা, কিন্তু রসুলাল্লাহ ঠিক এমনই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৪০০ বছর আগেই উম্মতে মোহাম্মদী নামক জাতি গঠন করেছিলেন।

ইসলামের সর্বশেষ সংস্করণ এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আসমানী গ্রন্থটি অর্থাৎ কোর'আন আল্লাহ নিজে কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন। বলা বাহুল্য পূর্ববর্তী কেতাবগুলো ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, এবং শেষ ইসলামও তাদের অতিবিশ্লেষণের ভারে বিকৃত হতে হতে বিপরীতমুখী হয়ে গেছে, কেবল অক্ষত আছে কোর'আনের বর্ণগুলো। তার ব্যাখ্যা পাল্টে বহু রকম হয়ে গেছে। এ কথাটিই আল্লাহর রসুল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, **"এমন সময় আসবে যখন ইসলাম শুধু নাম থাকবে, কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, মসজিদসমূহ হবে লোকে লোকারণ্য কিন্তু সেখানে দিক-নির্দেশনা বা হেদায়াত থাকবে না। আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে নিকৃষ্টতম জীব। তাদের সৃষ্ট ফেতনা তাদের দিকেই ধাবিত হবে (আলী রা. থেকে বায়হাকি, মেশকাত)।** যাহোক, পূর্বের সেই ধর্মগুলোও কিন্তু ইসলামই ছিল, শুধু সময়ের পরিবর্তনের দরুন দীনের বিধি বিধানের মধ্যে আল্লাহ পরিবর্তন এনেছিলেন বলে সেগুলো নানা ধর্মের রূপ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচয় নিয়ে মানবজাতিকে নানা ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে।

এটা সাধারণ জ্ঞান যে কোনো ব্যবস্থা বা সংবিধানের সর্বশেষ সংস্করণটিই মানতে হয়। তাই আল্লাহর শেষ রসুল ও শেষ কেতাব এসে যাওয়ার পর পূর্ববর্তী সমস্ত

নবী, কেতাব, ধর্ম ইত্যাদির প্রতি ঈমান রাখা বাধ্যতামূলক হলেও সেগুলোর বিধান প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র মানবজাতির জীবনে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব নয়। এ কারণে অশান্তিতে পূর্ণ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়ভার নিয়েই জন্ম হয়েছিল উম্মতে মোহাম্মদীর, যে দায়িত্বের সময়সীমা কেয়ামত পর্যন্ত। তারা যদি তাদের এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে ইসলামের বিকৃত হয়ে যাওয়া পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর অনুসারীদের পক্ষে সম্ভবই নয় যে তাদের ধর্ম দিয়ে বিশ্বমানবতাকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। তাই উম্মতে মোহাম্মদীকেই অগ্রণী ভূমিকা রাখা অবধারিত। যদি তারা এই গুরুদায়িত্ব পালনের স্পৃহা ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তাহলে ধর্মবিবর্জিত মতবাদের উত্থানই অনিবার্য হয়ে যায়।

মুসলিমদের ঐতিহাসিক ব্যর্থতার মাসুলঃ

ত্রয়োদশ শতকে চেঙ্গিজ খান, তৈমুর লং ও হালাকু খানেরা যখন হিরাত, বাগদাদ, দিল্লি, সমরকন্দ, তুরস্ক, সিরিয়া, তাসখন্দ, মিশর ধ্বংস করেন তাদের মার খেয়ে ভোগ বিলাসে লিপ্ত তথাকথিত উম্মতে মোহাম্মদী তাদের খলিফা, উজির, আমিরগণসহ লাখে লাখে মারা যায় তখন তাদের ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত আকিদা, সামগ্রিক ধারণা হারিয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য সালতানাতগুলোও ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতির পায়ের নিচে চলে গেল। ভারতবর্ষ, কানাডা, মেক্সিকো, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, হংকং, মালয়েশিয়া প্রভৃতি হয়ে গেল ব্রিটেনের কলোনি। আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোসহ আরো বহু দেশ দখল করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন। পর্তুগীজরা কলোনি করলো ব্রাজিল, অ্যাঙ্গোলা, ম্যাকাও, ভারতের কিছু অংশে। ডাচরা কলোনি করলো ইন্দোনেশিয়ায়।

এই যে কলোনিগুলো তারা প্রতিষ্ঠা করলো সেগুলোতে কোটি কোটি মানুষকে তারা কার্যত দাসে পরিণত করলো। তাদের সকল প্রকার স্বাধীনতাকে হরণ করলো। স্থানীয়দের জমি দখল করার জন্য লাখে লাখে হত্যা করলো। সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাস অমানবিক নির্যাতন, নির্লজ্জ শোষণ, অসহায়ের ক্রন্দন আর সীমাহীন বঞ্চনায় পরিপূর্ণ। এই নির্মমতায় সবচেয়ে বেশি রক্তাক্ত হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ, রেড ইন্ডিয়ান, ইনকা ইত্যাদি স্থানীয় সম্প্রদায়। তাদেরকে দাসব্যবসায়ের পণ্যে পরিণত করা হলো, ক্ষেত, খামার, খনি, কারখানায়, পাহাড় ও বনভূমি কেটে নগর, রেলপথ নির্মাণের কাজে পশুর মতো খাটানো হতো। তাদেরকে বংশানুক্রমে ক্রীতদাস করে রাখা হয়। শাসনক্ষমতায় তাদের অংশগ্রহণের অধিকারের তো কোনো প্রশ্নই আসে না। তাদের কথা বলারও কোনো অধিকার ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে আর আফ্রিকায় চলছিল এই অবস্থা।

ফ্রান্সে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের জনগণ ছিল যাজকতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট। তাদের সব আদিগন্ত জমির মালিক ছিল সামন্তবাদী জমিদার ডিউক, আর্ল, কাউন্ট, ব্যারনরা। গির্জারও ছিল নিজস্ব সেনাবাহিনী ও লক্ষ লক্ষ একর নিষ্কর জমি। যাজকদের প্রধান অস্ত্র ছিল ফতোয়া। স্বাধীনতাকামী বা ভিন্নমতের মানুষকে ডাইনি, ভুতগ্রস্ত, ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে শূলবিদ্ধ করত, আগুনে

পুড়িয়ে মেরে ফেলত। এই পরিস্থিতিই ফ্রান্স ইতালির মানুষকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল করেছিল যার পরিণতিতে সূত্রপাত হয়েছিল রেনেসাঁর। ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ ভলতেয়ার, মন্টেস্কু, রুশো প্রমুখ দার্শনিকদের তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে নেপোলিয়নের অনন্য নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের পতন ঘটালো। একইভাবে ইউরোপের রেনেসাঁর নেতৃত্ব দিয়েছেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, ভিঞ্চি, রাফায়েলের মতো শিল্পীরা, ম্যাকিয়াভ্যালি, থমাস মুরের মতো রাজনৈতিক দার্শনিকরা, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, কেপলারের মতো বিজ্ঞানীরা, মার্টিন লুথারের মতো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা। সকলেই জানেন যে ইউরোপের এই বর্বর মধ্যযুগে মুসলমানদের ছিল স্বর্ণযুগ। কিন্তু সেই মুসলমানরা তাদের অচিন্ত্যনীয় উৎকর্ষ নিয়ে যার যার গদিতে বসে ছিলেন অথবা গদি নিয়ে মারামারিতে লিপ্ত ছিলেন। মুসলিম সভ্যতার উৎকর্ষ পশ্চিমা রাজতন্ত্রগুলোর দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদেরকে নবজাগরণের দিকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু ইসলামকে গ্রহণ করার কোনো অভিরুচি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নি। সেটা কেন তার ব্যাখ্যা পরে দিচ্ছি।

উত্তর আমেরিকাতেও সভ্যতার সূচনা হলো। প্রথমে আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে গড়ে উঠলো নতুন সরকার কাঠামো, ধীরে ধীরে তা পশ্চিমে বসবাসকারী আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের এলাকাগুলোতেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলো। নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় যে শতাব্দীগুলো পার হয়েছে সে সময়ের ইতিহাস জানলে কোনো হৃদয়বান মানুষ স্থির থাকতে পারবেন না। কীভাবে ইউরোপের ডাকাতগুলো এসে উপজাতিদের সাথে প্রতারণা, ছলনা ও শক্তি দিয়ে তাদের দেশ দখল করে নিয়েছে। ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার হয়েছে অন্যভাবে, কারণ এখানে তাদের চেয়েও অনেক অনেকগুণ উন্নত মুসলিম সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাহোক মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করার জন্য, নিপীড়িত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ১৭৭৬ সালে থমাস জেফারসন আমেরিকান বিপ্লবের যে Immortal declaration দান করলেন তার মূলকথা হচ্ছে "All men are created equal"। এটিকে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বলা হয়ে থাকে। পাঠক, লক্ষ্য করুন এই ঘোষণাটি কি আদৌ কোনো নতুন ঘোষণা? সকল ধর্মগ্রন্থে কি হাজার হাজার বছর ধরে এই কথাটি উল্লেখিত হয় নি? অন্য ধর্মগুলোর কথা না হয় নাই বললাম, শেষ ইসলামের ধারক মুসলিম জাতির কি দায়িত্ব ছিল না এই সময়ে মুক্তির উপায় নিয়ে এগিয়ে আসা? ইসলামের সেই অক্ষয় বাণী নিয়ে তো উম্মতে মোহাম্মদী নিপীড়িত মানুষকে তখন মুক্তির দিকে আহ্বান করে নি। যে ইসলাম মানবজাতির একদা ক্ষুধার্ত বঞ্চিত মানুষকে দেখিয়েছে মুক্তির পথ, গড়ে তুলেছে অনন্য সভ্যতা ইতিহাসের এই বাঁকে এসে তা মুখ থুবড়ে পড়ল, যখন মানুষ মুক্তির জন্য পাগলপারা, তখন ইসলাম তাদেরকে কোনো সমাধান দেখাতে পারল না। কারণ মুসলিমরাও তখন অন্যান্য ধর্মগুলোর মতো ধর্মকে ইহকাল থেকে পরকালে নির্বাসন দিয়ে সওয়াব আর ফজিলত নিয়ে ব্যস্ত। নতুন কোনো মহামানব নবী-রসুল হয়ে আসলেন না, কারণ নব্যুয়তও শেষ। কিন্তু উম্মাহ যদি তাদের উপর নবীর অর্পিত দায়িত্ব পালন করত তাহলে ধর্ম এবারও মানুষকে মুক্তি দিতে পারতো। কেননা

মুক্তির পথ তো রসুল দেখিয়েই গেছেন আর শেষ বিধানও আল্লাহর দয়ায় অবিকৃত ছিল এবং আজও আছে।

ইসলাম কর্তৃক দাসপ্রথা উচ্ছেদ, পথভ্রষ্ট মুসলিম কর্তৃক দাসপ্রথা পুনঃপ্রবর্তনঃ

কথা হচ্ছিল দাসপ্রথা নিয়ে। আল্লাহর রসুল যখন এসেছিলেন তখনও আরবে দাসপ্রথা ছিল। একটি প্রথা তো একদিনে বিলুপ্ত করা যায় না, কারণ মানুষের চিন্তায় ও জীবনের সাথে তা ওতপ্রোতভাবে জাড়িয়ে যায়। তিনি এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। এ বর্বর প্রথার বিলুপ্তি সাধনের ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি ক্বাবা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে, "হে মানুষ! আমি জানি, জাহেলিয়াতের যুগে দাসদের কোনো মর্যাদা ছিল না। পশুর চেয়েও তাদেরকে অধম মনে করা হতো। সর্বত্র আমির ও গোত্র-সর্দাররা সম্মান ও কর্তৃত্বের মালিক সেজে বসেছিল।

আল্লাহর বান্দারা এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে, মানুষ হিসাবে সবাই সমান (All men are created equal) এবং তোমাদের অধীন দাসেরাও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী। সেটা ছিল এমন এক যুগ, যখন আমির, ওমরাহ এবং শাসকবর্গ নিজেদেরকে মানবীয় স্তরের ঊর্ধ্বে মনে করত। নিজেদেরকে নিষ্পাপ ঘোষণা করত। তাদের দৃষ্টিতে দাসদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল শুধু মনিবদের খেদমত করা এবং তাদের জুলুম সহ্য করা। মনিবদের সাথে দাসদের বসা নিষিদ্ধ ছিল। তাদের সামনে দাসদের কথা বলা পাপ ছিল। মনিবদের কোনো কাজের সামান্যতম বিরুদ্ধাচারণ হত্যাযোগ্য অপরাধ ছিল। **ইসলাম এ ধরণের অপ-সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়েছে এবং অজ্ঞতার যুগের অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।**

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি যে, তোমাদের রবের নির্দেশ হচ্ছে: "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" (সুরা হুজরাত ১৩)

আল্লাহ বর্ণিত এই মুত্তাকি কারা। মুত্তাকি শব্দটি এসেছে তাকওয়া থেকে। তাকওয়ার অর্থ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বেছে বেছে পথ চলা। যিনি এই পথ চলার সময় যত বেশি ন্যায় অন্যায় বেছে চলেন তিনি তত বড় মুত্তাকি। বিদায় হজ্বের ভাষণে তাই মহানবী (সা.) বলেছিলেন, অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই আবার আরবের উপর অনারবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই।

এই দাসপ্রথাকে ধূলিসাৎ করার রূপরেখা দান করে নিজের জীবদ্দশায় সেটার যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করে রসুলাল্লাহ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তার কয়েক শ' বছর যেতে না যেতেই আরবরা আবার সেই জাহেলিয়াতের দাসপ্রথাকে কবর থেকে তুলে এনে যুদ্ধবন্দী, উপপত্নী ইত্যাদি নানা ফতোয়ার ফাঁকফোকর বের করে মুসলিম সমাজে কায়েম করলো। অন্যান্য রাজা বাদশাহদের মতো তারাও নিগ্রোদেরকে

দাসরূপে ব্যবহার করতে লাগল। সেই কলঙ্ক দাগ ইসলামের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করলো। এভাবেই মুসলিমরা ইসলামের শিক্ষাকে ছুঁড়ে ফেলে অন্ধকার যুগের সংস্কৃতিতে ফিরে গিয়েছিল। এর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে আজও মনে করা হয় যে ইসলামে দাসত্বপ্রথা বৈধ নয় কেবল, উৎসাহিত করে। তাই ইউরোপের মধ্যযুগ ও ঔপনিবেশিক যুগে বিশ্বজুড়ে যখন দাসদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ক্রন্দন করছে, তখন তা মুসলমানদের কর্ণকূহরে প্রবেশ করে নি, হৃদয়েও কোনো রেখাপাত করে নি, তাদের কর্তব্যবোধকে উজ্জীবিত করে নি। সেই অন্যায় অনাচার উচ্ছেদ করাই যে তাদের এবাদত ছিল তা তাদের বোধগম্য হয় নি।

মুসলিমদের ব্যর্থতার আঁতুরঘরে জন্ম নিয়েছে গণতন্ত্রঃ

মুসলিমরা না দাঁড়ালেও আব্রাহাম লিঙ্কন দাঁড়িয়েছিলেন আমেরিকার সেই দাসদের পাশে। তিনি ১৮৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাস প্রথার অবসান ঘটান এবং মুক্তি ঘোষণার (Emancipation Proclamation) মাধ্যমে দাসদের চিরস্থায়ীভাবে মুক্ত করে দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ১৯৪১ সালে স্টেট অফ ইউনিয়ন ভাষণে বলেন, মানুষের জন্য চারটি স্বাধীনতা (Four Freedom) নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয়। তিনি বলেন, সামনের দিনগুলোতে আমরা এমন একটি পৃথিবী দেখতে চাই যার ভিত্তি হবে মানুষের চারটি স্বাধীনতা।

1. Freedom of speech and expression everywhere in the world. (মত প্রকাশের স্বাধীনতা - পৃথিবীর সর্বত্র)

2. Freedom of every person to worship God in his own way—everywhere in the world. (নিজস্ব পদ্ধতিতে স্রষ্টার উপাসনা করার অধিকার - পৃথিবীর সর্বত্র)।

3. Freedom from want— means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants—everywhere in the world. (দারিদ্র্য থেকে মুক্ত থাকা - অর্থনৈতিক বোঝাপড়া যা প্রতিটি জাতিরাষ্ট্রের অধিবাসীদের সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবন উপহার দেবে।)

4. Freedom from fear—means a world-wide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor—anywhere in the world. (শঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা - সারা পৃথিবীতে অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করা হবে এমনভাবে যেন কোনো রাষ্ট্র তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে না পারে - পৃথিবীর সর্বত্র)

তিনি যখন এই ঘোষণা দেন তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। চার বছর পরে তারাই হিরোশিমা নাগাসাকিতে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ঘটান। তারপর

থেকে গণতন্ত্রের ঘষামাজা অব্যাহতভাবেই চলছে। মানুষ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক গণতন্ত্র মানার চেষ্টা করছে। কিন্তু পরিণাম কী হলো? সারা পৃথিবীতে এত রক্তপাত, এত ভীতি, এত অস্ত্রের ঝনঝনানি, এত গৃহহারা মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে কেন? এটা কি গণতন্ত্রের পরিণাম? নাকি এখনও গণতন্ত্র শিশু?

যাহোক, Four Freedom এর ঘোষণাগুলো কি ধর্মগ্রন্থগুলোতে বহু পূর্ব থেকেই সঞ্চিত নেই? অবশ্যই আছে। কিন্তু ধর্মের ধারকবাহকরা সেই সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসেন নি। যারা এগিয়ে গেলে কাজ হতো সেই মুসলিমরাও এগিয়ে আসে নি। পক্ষান্তরে যারা মুক্তির বাণী নিয়ে আসলেন যথা লিঙ্কন, আসলেন জেফারসন, আসলেন ওয়াশিংটন তাদেরকেই ইসলামের পণ্ডিত আলেম ওলামারা কাফের, নাস্তিক বলে গালাগালি করেন। তারা কাফের না নাস্তিক সেটা গুরুত্বপূর্ণ রইল না, কারণ তারাই সেই ঘোষণাটি দিলেন যার জন্য মানুষ তৃষ্ণার্ত ছিল। তারা বললেন, সাদা-কালো সবাই মিলে সরকার নির্বাচিত করবে, সেই সরকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার অধিকার রক্ষা করবে। সেখানে সবাই সমান। সবাই এক স্রষ্টার সৃষ্টি। এই পৃথিবীর উপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। তারা মুক্তি দিতে পারেন নি, কিন্তু চেষ্টা করেছেন। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

অপরদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, রাশিয়ার জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, চীনের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী বঞ্চিত মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা দান করলেন কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং, চে গুয়েভারা, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও', 'কেউ খাবে কেউ খাবে না- তা হবে না, তা হবে না'। তারা মানুষকে আশা দিলেন যে সাম্যবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো প্রয়োগ করা হলে দুনিয়াটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। মানুষ তাদের সেই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিল।

প্রচলিত ধর্মগুলোর অসারতা ও ধর্মের ধারকবাহকদের অন্ধত্ব দেখে ধর্মকেই অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলেন মার্কস। বললেন, "জনগণের সুখলাভের প্রথম শর্ত হলো ধর্মের বিলোপসাধন করতে হবে।" মানুষ ধর্মের বিকৃতরূপের অসারতা ও কুফল বুঝতো বিধায় তার এই বক্তব্যে যুক্তি খুঁজে পেল। ক্রমেই ধর্ম হয়ে গেল ব্যক্তিগত ঐচ্ছিক বিষয়, জাতীয় জীবনে এর কোনো অংশগ্রহণ রইল না। ধর্মকে বাদ দিয়ে যখন মানুষ পাশ্চাত্যের দার্শনিক, চিন্তাশীল মানুষ ও রাজনীতিবিদদের তৈরি করা জীবনশৈলীকে গ্রহণ করে নিল ইসলামসহ সকল ধর্মের আবেদন ও প্রয়োজনীয়তা ওখানেই কি শেষ হয়ে গেল না?

ইসলাম বিবেচনায় আসছে না যে কারণেঃ

আজকে সারা দুনিয়াতে ইসলামকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বহু তাত্ত্বিক, বহু চিন্তাবিদ, বহু রাজনৈতিক দল চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু কোনোভাবেই ইসলামকে আধুনিক মানুষ তাদের গ্রহণযোগ্য জীবনধারা হিসাবে বরণ করছে না, বিবেচনাও করছে না। এই পরিস্থিতির বীজ রোপিত হয়েছে ইতিহাসের মানবতার ঐ ক্রান্তিলগ্নে যখন মুসলিমরা অসহায় মানুষদের মুক্তির জন্য সামান্য চেষ্টাও করে নি। কারণ মুসলিমরা তাদের হাতে সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষের মুক্তির জন্য

মধ্যযুগের বর্বরতা বন্ধ করার জন্য ইউরোপে যায় নি, ফ্রান্সে যায় নি, দাসত্বপ্রথা রদ করতে আমেরিকায় যায় নি, জারতন্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে প্রলেটারিয়েটদের বাঁচাতে রাশিয়ায় যায় নি। **তারা উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে নিপীড়িত মানুষকে গিয়ে এ কথা বলতে পারে নি যে, তোমাদের উপর যে অত্যাচার চলছে এটা অধর্ম। আমাদের ক্রীতদাস বেলালকে (রা.) সেই কাবার ঊর্ধ্বে উঠিয়েছি যে কাবার দিকে ফিরে আমরা আল্লাহকে সেজদাহ করি, আমরা সব মানুষকে কেবল সমানই করি নি, বরং নির্যাতিত নিপীড়িত সত্যনিষ্ঠ মানুষকে আমরা মাথার উপরে রেখেছি। আমাদের নবী এটা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন যে, সবার ঊর্ধ্বে মানুষ।**

ভোগ বিলাসের ঘৃণ্য অধ্যায়ঃ

মুসলিমরা তখন কী করছিল? তারা তখন স্থবির, অন্তর্মুখী এ জনগোষ্ঠীর সুলতান, আমির, ওমরাহরা তাদের প্রাসাদের হেরেমে হাজার হাজার নারী আর অঢেল সুরার নেশায় বুঁদ হয়েছিল। তাদের অকল্পনীয় ব্যসন বিলাস আর অপচয়ের বিবরণ মুসলিম জাতির জন্য অত্যন্ত ন্যাক্করজনক অধ্যায়। আমি প্রফেসর পি. কে. হিট্টির লেখা দ্য হিস্ট্রি অব দ্য অ্যারাবস থেকে তাদের পাশবিক ভোগবিলাসিতার কিছু নজির তুলে ধরছি।

"যদিও বাগদাদের উত্থান কাহিনী অর্ধশতকের চেয়ে কম প্রাচীন, কিন্তু ঐ সময়ে বাগদাদ ধনসম্পদ এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বের দিক থেকে বিশ্বসেরা হয়ে উঠেছিল। বাইজানটাইন রাজধানীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একাকী মাথা উঁচু করে রাখার ক্ষমতা ছিল বাগদাদের। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বাগদাদ অত্যুৎকর্ষ হয়ে ওঠে। তখন বাগদাদ এমন এক শহরে পরিণত হয়, সারা পৃথিবীতে তার জুড়ি ছিল না।

গোলাকার নগরীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে অবস্থিত ছিল রাজকীয় প্রাসাদ। খলিফার বিবি যুবাইদাহ (যিনি সম্পর্কে তাঁর চাচাতো বোন ছিলেন) স্বামীর সঙ্গে যাবতীয় সম্মানজনক কাজকর্মে অংশীদার ছিলেন। খলিফা এবং তাঁর বিবি খাবার টেবিলে সোনা বা রূপা ছাড়া অন্য ধাতুর তৈরি কোনো বাসন রাখা পছন্দ করতেন না। শুধু সোনা-রূপার তৈরি নয়, তাতে দামী পান্নার কারুকার্য থাকত। বিবি যুবাইদাহ অত্যন্ত ফ্যাশন প্রেমিক ছিলেন। তিনিই প্রথম আরবী মহিলা যিনি জুতোয় দামী মণিমুক্তো লাগান।

খলিফার অভিষেক অনুষ্ঠান, বিবাহ, তীর্থযাত্রা এবং বিদেশি দূতের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাগদাদের রাজসভার ধনসম্পদ এবং শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত। ৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল-মামুনের বিবাহ হয়। পাত্রী ছিলেন তাঁর উজির আল-হাসান ইবনে সহল এর ১৮ বছরের কন্যা বুরান। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের সমারোহে এত অর্থব্যয় হয় যে, আজও আরবী সাহিত্যে এই বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা ব্যতিক্রমী হিসেবে লিখিত হয়ে রয়েছে। বিবাহের অনুষ্ঠানে বর-কনে বসেছিলেন একটি সোনার বিছানায়। একটি সোনার রেকাবি থেকে তাদের মাথায় ঢালা হয় নানা আয়তনের কয়েক হাজার মুক্তা। বিয়ের রাতে স্পার্ম-তিমির উদর থেকে পাওয়া যায় যে মোম জাতীয় পদার্থ, যাকে

বলা হয় অ্যাম্বর, তার তৈরি অত্যুজ্জ্বল বাতি জ্বালানো হয় রাতভর। আর নিমন্ত্রিত যুবরাজ এবং বিশিষ্ট অতিথিদের উদ্দেশে ছড়ানো হয় কস্তুরির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল, যার প্রত্যেকটিতে ছিল একটি করে টিকিট। ওই টিকিট পাওয়ার সুবাদে কেউ পেয়ে যান একটি অঞ্চল, কেউ বা একজন ক্রীতদাস এবং হরেক রকমের দানসামগ্রী।

৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল মুক্তাদির বিশাল সমারোহ করে সপ্তম কনস্ট্যানটাইন যুবরাজকে অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে দু' দেশের বন্দী বিনিময় এবং মুক্তির চুক্তি হয়। এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ১ লক্ষ ৬০ হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য, ৭০০০ কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ খোজা এবং ৭০০ অমাত্য। অভ্যর্থনার দিন যে মিছিল বেরোয় তাতে যোগ দেয় ১০০ সিংহ। খলিফার প্রাসাদে ৩৮ হাজার পর্দা টাঙানো হয় যার মধ্যে ১২,৫০০ টি ছিল মণিমুক্তা বসানো। এছাড়া পাতা হয় ২২,০০০ কার্পেট। বিদেশী দূতবৃন্দ এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা ভুল করে প্রথমে অমাত্যদের কার্যালয়ে ঢুকে পড়েন। পরে ঢুকে পড়েন উজিরদের কার্যালয়। শেষে ঢোকেন রাজদরবারে। এঁরা সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন, বৃক্ষ-গৃহ (দার-আল-শাজার) দেখে। ঐ গৃহে ছিল সোনা এবং রূপার তৈরির ৫ লক্ষ ড্রাম ওজনের কৃত্রিম গাছ। গাছের ডালে ডালে ছিল মূল্যবান ধাতুর তৈরি পাখি সে যুগে তা এমন ভাবে তৈরি করা হয় যে মাঝে মাঝেই যন্ত্রের সাহায্যে পাখি গুলো ডেকে উঠত। বাগানে কৃত্রিম ছোট মাপের খেজুর গাছ গড়া হয়েছিল পাথরের সাহায্যে। এই সব শিল্পকর্ম চর্চার মাধ্যমে অপূর্ব শিল্পকর্মের জন্ম হয়েছিল।

খলিফা আল-আমিন (৮০৯-৮১৩) এক সন্ধ্যায় স্রেফ আবু-নুওয়াসের লেখা কয়েকটি কবিতা শোনানোর জন্য তাঁর নিজের চাচা ইব্রাহিম-ইবনে-আল-মাহদীকে ৩ লক্ষ দীনার দান করেন। ইবরাহিম ছিলেন সে কালের বিখ্যাত গায়ক। তিনি এভাবে রাজপরিবারের কাছ থেকে আনুতোষিক বাবদ মোট ২ কোটি দিরহাম পেয়েছিলেন।

আল-আমীন টাইগ্রিস নদীর বুকে যে ভোজ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাতে বিভিন্ন জীবজন্তুর আকারে অসংখ্য বজরা বানানো হয়। যার মধ্যে এই ভোজসভা হয়। এইসব বজরার একটি ছিল ডলফিনের মতো, একটি সিংহের মতো একটি ঈগল পাখির মতো। এক একটি বজরা নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ৩০ লক্ষ দিরহাম। আগানিতে আমরা এক বর্ণময় ব্যালে নৃত্যের বর্ণনা পাই। এই ব্যালে নৃত্য হয়েছিলো খলিফা আল-আমীনের সৌজন্যে সারারাত ধরে। এই অনুষ্ঠানে বহু সুন্দরী নর্তকী সঙ্গীতের ছন্দে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই এই নাচ-গানে অংশগ্রহণ করেন। আরেক ভোজসভার নিমন্ত্রিতদের প্রত্যেককে মাছ পরিবেশন করা হয়। নিমন্ত্রিতরা ঐ মাছের টুকরোগুলো খুব ছোট বলে মন্তব্য করলে জবাবে বলা হয়, **প্রতিটি টুকরোই মাছের জিভ। মোট ১৫০ টি মাছের জিভের ডিশের জন্য ১০০০ দিরহামেরও বেশি দাম পড়েছে।"**

তো এই খলিফা নামধারী সুলতানদের অর্থপুষ্ট দরবারী আলেমরা তাদের সব অনৈতিক কাজকে রজত আর স্বর্ণের বিনিময়ে জায়েজ করে যাচ্ছিলেন আর ইমাম-

ফকীহরা দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ফতোয়া আর মাসলা মাসায়েলের পাহাড় বানিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা এ জাতিকে শেখাচ্ছিল এক হরফে কয় নেকি। তারা বিতর্ক করছিলেন যে আল্লাহর রসুল মাটির তৈরি নাকি নূরের তৈরি। আল্লাহর প্রতিশ্রুত শাস্তিও আসতে দেরি হলো না। না হলে কোথাকার পাহাড়ি উপজাতি মঙ্গোল হালাকু খান কেন ইতিহাসের চরমতম পৈশাচিক রূপ নিয়ে এই মুসলিমদের উপর নাযিল হলো। আল্লাহ সুরা তওবার ৩৯ নম্বর আয়াতে সেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, "হে মো'মেনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ রাস্তায় (মানবতার কল্যাণে) অভিযানে বের হওয়া পরিত্যাগ কর তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি (আজাবুন আলিমা) দিয়ে অন্য জাতি তোমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন।" যাদেরকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি (আজাবুন আলিমা) দিবেন তারা কি মুসলিম, মো'মেন, উম্মতে মোহাম্মদী থাকে? অসম্ভব।

মালাউন মুসলমানদের তবুও বোধদয় হলো না। তারা বুঝলো না যে কেন এই গজব। তারা বুঝল না যে, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্ম হেরেমে নারী সুরায় মজে থাকার জন্য হয় নি, তফসির ফেকাহ নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করে তা নিয়ে ফেরকা মাজহাব সৃষ্টি করার জন্য নয়, খানকা আর মারকাজের চার দেওয়ালের মধ্যে বসে আত্মার ঘষামাজা করে সুফি-দরবেশ, সংসারবিমুখ বৈরাগী হওয়ার জন্য নয়। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জীবনের যাবতীয় বঞ্চনা লাঞ্ছনাকে মুছে দেওয়ার জন্যই এদের জন্ম হয়েছিল। এটা করতে পারার মধ্যেই রয়েছে মো'মেন জীবনের সার্থকতা। কিন্তু তারা সেই আদর্শ নিজেদের হাতে নিয়ে বসেছিল।

আদর্শের সঙ্কট মেটাতে জন্ম নিল নতুন নতুন আদর্শ, বলা যায় নতুন নতুন জীবনব্যবস্থা, দীন বা ধর্ম। ধর্মের যে কাজ অর্থাৎ মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান সেটা বিকল্প এই জীবনব্যবস্থাগুলো পূর্ণ করে দিল। গণজাগরণ হলো, বিপ্লব হলো, সুখী সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য উদ্দাম কর্মস্পৃহা নিয়ে ধর্মহীন নেতাদের নেতৃত্বে কাজে নামলো মানুষ। তাদের সামনে আর ইসলামের নবীর মাহাত্ম্য রইল না। তাদের সামনে আব্রাহাম লিংকন, রুশো, নেপোলিয়ন, কার্ল মার্কসই উদ্ধারকর্তা হিসাবে গৃহীত হয়ে গেল। শেষ রসুলের (সা.) ১৬০ কোটি অনুসারীদের অধিকাংশই ইতোমধ্যে তাদেরকেই অর্থাৎ তাদের ধর্মহীন মতাদর্শকেই জাতীয় অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনে শিক্ষাব্যবস্থায় অনুকরণ অনুসরণ করছে। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই এখন তাদের অন্ধ অনুসারী।

ইসলামিক গণতন্ত্র ও প্রগতিহীন ধর্মের অপ্রযোজ্যতাঃ

একটি প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে, গতিশীলতাই জীবন, স্থবিরতাই মৃত্যু। স্থবিরতার শিক্ষা নিয়ে স্থবির মুসলিমজাতি মৃত্যুবরণ করলো। আর ওদিকে পশ্চিমে প্রবল গতি সঞ্চার হলো নতুন সভ্যতার চাকায়। ফলে এক ঝটকা দিয়ে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্প, শিক্ষা সর্বদিকে তারা উঠে গেল উন্নতির শীর্ষে। কিন্তু সে উন্নতি কেবল বৈষয়িক উন্নতি।

শুধু বৈষয়িক উন্নতি একটি প্রহেলিকা। যেহেতু মানুষ একটি উন্নত প্রাণী, তার

ভিতরে আল্লাহর রূহ বর্তমান, তার বিবেকবোধ একটি বাস্তবতা। তাই কেবল বৈষয়িক উন্নতি তাকে সুখী করতে পারে না। তার দেহের সুস্থতার জন্য যেমন অনেক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হয় তেমনি, আত্মার সুস্থতার জন্য প্রয়োজন হয় একান্ত চিন্তার অবসরের, প্রয়োজন হয় হাসি ও কান্নার, স্নেহ-মায়া-মমতার, প্রয়োজন হয় ভালোবাসার, বাক ও চিন্তার স্বাধীনতার, প্রয়োজন হয় অবাণিজ্যিক সামাজিক ও ব্যক্তিগত বন্ধনের, প্রয়োজন হয় শিল্পচর্চার।

একটি ভালো জীবনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যা মানুষের এই আত্মাকে, বিবেককে, মনুষ্যত্বকে বিকশিত করবে, ক্রমশ উন্নত করে তুলবে। আর যে জীবনব্যবস্থা মানুষের মনুষ্যত্বের অবনতি ঘটায় তা নিকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা। আইন তৈরি করে পুলিশ বাহিনী দিয়ে মানুষের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু তার আত্মাকে, চিন্তাকে - যেখানে অপরাধের জন্ম হয় সেই জায়গাটিকে তো কোনো আইন দিয়ে শৃঙ্খলিত করা যায় না। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস সেই জায়গাটিতেও পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে সর্বত্র বিরাজমান স্রষ্টার নিয়ত উপস্থিতির ধারণা, তার কাছে জবাবদিহির চিন্তা থেকে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকে। কিন্তু আজ ধর্ম সেটা পারছে না কারণ প্রতিটি ধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে এবং সেগুলো আত্মাহীন বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দিয়ে মানুষের মনের স্বাভাবিক বিকাশসাধন ও জীবনযাপনের জন্য সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

অপরদিকে বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থাগুলো প্রবর্তনের ফলে নৈতিক মূল্যবোধ মান্য করা ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হওয়ায় জীবনের এই জায়গাটিতে একটি বিরাট ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়ে অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে এবং পরিণামে অবধারিতভাবে পুলিশি রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম দিচ্ছে। যার ফলে না সাম্যবাদ মানুষকে শান্তি দিয়েছে, না গণতন্ত্র শান্তি দিচ্ছে। **স্রষ্টা প্রেরিত সব জীবনব্যবস্থারই একটি স্বর্ণযুগ ছিল, কিন্তু গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের কোনো স্বর্ণযুগ নেই, পুরোটাই অশান্তি, অবিচার আর জবরদস্তিমূলক প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ অন্ধকার যুগ।** উন্নতি বলতে একটাই দেখানো যায় যে, বস্তুগত, প্রযুক্তিগত উন্নতি। অন্ধকারের মধ্যে বস্তুর রঙের কোনো মাহাত্ম্য নেই, সবই নিকষ কালো। সমাজের আলো হচ্ছে শান্তি, ন্যায়, সুবিচার।

ধর্মের বাণী, ইসলামের বাণী আর এখন মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করে লাভ নেই। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা প্রমাণিত হওয়ার পর এখন এসব মতবাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট আরেকটি আদর্শ লাগবে যেটার সন্ধান ১৪০০ বছরের বিকৃত ইসলাম দিতে পারবে না। সেটার সন্ধান ইসলামের বড় বড় চিন্তানায়কদের লেখা হাজার হাজার বইয়ের মধ্যেও নেই। এই যে বইগুলো তারা লিখেছেন সেগুলোতে বিভিন্ন মাজহাব ফেরকার ইমাম, ফকিহ, আলেমদের লেখা কেতাব ঘেঁটে ইসলামের জাতীয় জীবনের বিধি-বিধান ও ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ১৪০০ বছরে বিকৃত হয়ে যাওয়া ইসলামের তত্ত্ব ও ইতিহাসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পোস্টমর্টেম করে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেছেন মাত্র। তাদের মতবাদে আকৃষ্ট

হয়ে কোটি কোটি মানুষ তাদের দলগুলোতে গিয়ে ভিড়েছে।

এই কোটি কোটি মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করা হয়েছে, তাদেরকে "ইসলামিক গণতন্ত্র" নামক উদ্ভট ও প্রতারণামূলক মতবাদে বিশ্বাসী করে তুলে নবতর ধর্মব্যবসার উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তাদের এই উদ্যোগগুলোর ব্যর্থতা দিন দিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের রাজনৈতিক দলগুলো একটা একটা করে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। এর বড় একটি কারণ হচ্ছে জীবন চালাতে মানুষের তো এখন আর ইসলামের দরকার নেই। প্রকৃতি কখনো শূন্যতা পছন্দ করে না, যে কোনো কিছুর শূন্য সে ভালো দিয়ে না পারলে মন্দ দিয়ে হলেও পূর্ণ করে।

তাই আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়ায় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের চড়াই উৎরাই নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার পরে ধর্মের সেসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিশ্বব্যবস্থার কোনো মূল্য তো এখন নেই। **মূল্যহীন, উদ্দেশ্যহীন কোনো কিছুর অস্তিত্বও প্রকৃতি সহ্য করে না, সময় সেগুলোকে জীর্ণ করে এবং একটা সময়ে সেগুলোকে ইতিহাসের ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে। সে কারণে গত কয়েক শতাব্দী থেকে যাবতীয় ধর্মকেই প্রাচীন যুগের বুদ্ধিমান মানুষের কল্পনা বলে জীবনের বাস্তব অঙ্গন থেকে বিদায় করার চেষ্টা করা হচ্ছে।** কেউ আবার ভাববেন না যে আমি ধর্মের বিরুদ্ধে বলছি। আমি সত্যধর্মের একজন সেনানী। আমি কেবল ধর্মের নামে চলা অধর্মকে আলাদা করার চেষ্টা করছি। ধর্ম এখন প্রথাগত অন্ধ বিশ্বাসের কারাগারে অবরুদ্ধ। সেখানে যুক্তির কোনো স্থান নেই। অথচ একে যদি বাস্তবজীবনের উপযোগী করা না হয়, তাহলে মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা পুনরুদ্ধার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর ইসলামকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য সংস্কারের কথা বললে ফতোয়ার খড়্গ উঁচিয়ে কাফের কাফের বলে তেড়ে আসবে এই ধর্মেরই ধারকবাহকেরা। চিরকাল এই তাড়া খেতে হয়েছে সব নবী-রসুল ও অবতারদের। কিন্তু তারা ঠিকই পূর্ব ধর্মের প্রতিষ্ঠিত বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন এবং এভাবেই মানব ইতিহাসে সত্য ও মিথ্যার লড়াই অব্যাহত থেকেছে। অতি ধার্মিকদের কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, আমি বুঝি ধর্মেরই বিরোধিতা করছি। কিন্তু তাদের ধারণা সঠিক নয়। **আমি কেবল ধর্মের নামে চলা অধর্মের বিরোধিতা করছি। এবং যারা মরিয়া হয়ে ইসলামকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় বার বার মুখ থুবড়ে পড়ছেন তাদেরকে এটা বলার চেষ্টা করছি যে, তারা আসল মারটা কোথায় খেয়েছেন।** যারা ইতিহাসের মূল্যায়ন সঠিকভাবে করতে পারে না, তারা ভবিষ্যতের পথেও ঠিকমত চলতে পারে না।

কার্ল মার্কসের আফিমতত্ত্বঃ

ইসলামকে সকল বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান হিসাবে এবং সর্বযুগে প্রযোজ্য নিয়ত সর্বাধুনিক জীবনব্যবস্থা হিসাবে আলেম ওলামারা প্রচার করে থাকেন। যখন মানবজাতি সত্যিকার আদর্শিক সঙ্কটগুলো অতিক্রম করেছে তখন তাদের সামনে ইসলামও ছিল, কিন্তু সেটা তারা কেন গ্রহণ করে নি? কেবলই কি বিদ্বেষবশত? না। তাদের সমস্যাগুলোর বাস্তব সমাধান ইসলাম দিতে পারবে এমন কোনো সম্ভাবনা

তারা ইসলামের মধ্যে দেখতে পায় নি। এ কারণেই একবাক্যে কার্ল মার্কসের মতো পণ্ডিত, দার্শনিক বলতে পেরেছেন যে, "ধর্ম এক প্রকার আফিম। জনগণের সুখলাভের প্রথম শর্ত হলো ধর্মের বিলোপসাধন করতে হবে।"

কার্ল মার্কস ধর্মকে আফিম বলেছেন। তাকে একদিক দিয়ে দোষ দেই না। তিনি 'ধর্ম' বলতে যা দেখেছিলেন তা অবশ্যই আফিম। তিনি দেখেছিলেন তার নিজের দেশে খ্রিষ্টান ধর্ম যেটা মানুষের জাতীয় জীবনের ব্যর্থতার কারণে ব্যক্তিজীবনে নির্বাসনের পর ওটা যাজক ও সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে শোষণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি "ধর্ম"কে দেখেছিলেন- ঐ একই অবস্থা প্রায়। তাদের মধ্যে যারা ধার্মিক তারা সংসার ত্যাগ করে হয় বনবাসে গেছেন, না হয় মন্দিরে, মঠে, প্যাগোডায় ঢুকেছেন- সমাজকে ছেড়ে গেছেন শোষক অত্যাচারীদের হাতে। ব্যতিক্রম তিনি দেখতে পেতেন এই শেষ 'ধর্মে'র দিকে চাইলে। কিন্তু তা পারলেন না, কারণ মার্কস যখন চিন্তা করছেন অর্থাৎ গত ঊনিশ শতাব্দী (খ্রিষ্টীয়) ততদিনে সামান্য কিছু লোকের মধ্যে ছাড়া, মোহাম্মদের (দ.) প্রবর্তিত 'ধর্ম' পৃথিবীতে নেই। মার্কস দেখলেন অন্যান্য আর দশটা 'ধর্মে'র মতই আরেকটি সেই অন্তর্মুখী 'ধর্ম' যার অনুসারীরা ইউরোপিয়ানদের জুতার তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, 'ধর্মে'র বিধান নিয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলি করছে, হাতে তসবিহ নিয়ে মসজিদে দৌড়াচ্ছে, খানকায় বসে পীর-মুরিদী করছে- সমাজের হর্তাকর্তারা শোষক, অন্যায়কারী। কাজেই মার্কস পৃথিবীর দিকে চেয়ে যে 'ধর্ম'গুলো তখন দেখলেন সেগুলোকে তিনি যে আফিম আখ্যা দিয়েছিলেন সেজন্য তাকে কিছুমাত্র দোষ দেই না, তিনি একেবারে সত্য কথা বলেছিলেন। মার্কসের প্রতি আমার অভিযোগ এই যে, তিনি শেষ ইসলামটাকে আর তার ইতিহাসটাকে ভালো করে পড়ে দেখলেন না, পড়লে মার্কস যদি অকপট হৃদয়ে মানবসমাজের শুধু অর্থনৈতিক নয় সব রকমের শোষণ, অন্যায়, অত্যাচার নির্মূল করতে চেয়ে থাকতেন তবে তাকে সমাজতন্ত্র আবিষ্কার করতে হতো না। সমাজতন্ত্র আবিষ্কার করে তিনি তো মানবজীবনের একটি মাত্র অঙ্গনে (Facet), অর্থনৈতিক অঙ্গনের, সমাধান বের করলেন। কিন্তু মানুষের জীবন কী শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাতেই পূর্ণ? নিশ্চয় নয়, অনেক কিছুই নিয়ে মানুষ। মানুষ যেমন দেহধারী, তেমন তার আত্মাও আছে, একটি জীবনব্যবস্থায় দুটো বিষয়কেই শান্তিময় করার প্রক্রিয়া থাকতে হবে। তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবন যেমন আছে তেমনি তার রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, বিচারিক জীবনও আছে। কিন্তু মার্কসের সমাধান হলো মানুষের জীবনের শুধু একটি অঙ্গনের, কেবল অর্থনৈতিক অঙ্গনের ভারসাম্যহীন সমাধান। এ সমাধান পূর্ণ সমাধান নয়, তাই ইতোমধ্যেই কার্যত সমাজতন্ত্রের কবর হয়ে গেছে, যতটুকু টিকে আছে সেটা পুরাতন নেতাদের নামের উপর ভর করে, জেনারেশন গ্যাপ হলে স্বাভাবিক নিয়মে সেটাও তিরোহিত হয়ে যাবে। ১৯৯০-তে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় মার্কসবাদীদের তীর্থভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়, তারপরই সারা দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর একে একে তাদের রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙ্গে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রচলন করে। মাও সেতুং-এর চীন এখন

ঘোর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। সে সময়ের গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকরা আজও দুর্বল কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের জয়গান করেন কিন্তু বাস্তবে তারা সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস লেলিনের আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং বর্তমানে তারা চরম পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। মার্কস শেষ জীবনব্যবস্থাটাকে খোলা মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পেতেন যে, মানুষের জীবনের প্রতি অঙ্গনের সমস্যার সমাধান এতে দেয়া আছে, শুধু অর্থনৈতিক নয়। আর **সেটা মানুষের সীমিত মগজের সমাধান নয়। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, শুধু মানুষকে নয় এই বিশাল বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দেয়া সমাধান।** সমাধান দিয়ে তিনি বলছেন- যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা কি তাঁর চেয়ে বেশি জানো? তারপর নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন- তিনি সমস্ত কিছুই জানেন (সুরা মুলক ১৪, সুরা হজ্ব ৬৩)। মার্কসের কাছে এ যুক্তির খণ্ডন আছে? মার্কস যদি এই জাতির ইতিহাস পড়তেন তবে দেখতেন বিশ্বনবী যে জীবনব্যবস্থা শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা প্রচণ্ড গতিশীল দুর্জয় এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, পশ্চাৎপদ আরবজাতিকে সভ্যতার শিখরে নিয়ে গিয়েছিল, যেন এক বিপুল বিস্ফোরণ। পরবর্তীতে ঐ বিস্ফোরণ ঝড়ের গতিতে অর্ধেক পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আফিম অমন করে বিস্ফোরিত করে না, বিপ্লব সৃষ্টি করে না, আফিম নিঃশব্দে বুঁদ করে দেয়, যেমন করে ফতোয়ার বিশ্লেষণ আর বিকৃত তাসাওয়াফের আফিম বিশ্বনবীর তৈরি এই মহা শক্তিশালী গতিশীল জাতিটিকে বুঁদ করে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে, আর তাই মার্কস অন্যান্য 'ধর্মে'র সাথে সাথে একেও আফিম বলতে পারছেন, আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা প্রতিবাদও করতে পারছি না।

প্রকৃত ইসলাম তো কার্ল মার্কস দেখেন নি, আমেরিকা, চীন, ফ্রান্সের জননায়করাও দেখেন নি। তারা দেখেছেন এমন একটি ইসলাম যা বলছে, খাওয়ার আগে লবণ খাও, খাওয়ার পরে মিষ্টি খাও। দাসত্বের নিগড়ে বন্দী উপবাসী দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে খাওয়ার পরে মিষ্টি খাওয়ার কথা বলে লাভ আছে? যাদের পোশাক নেই তাদের কাছে টাখনুর উপরে আর টাখনুর নিচে পোশাক পরার হাদীসের কী মূল্য। যাদের ঘর নাই তাদের কাছে ঘরে প্রবেশে দোয়ার কী মূল্য? আল্লাহর রসুল মসজিদকে জাঁকজমকপূর্ণ করেন নি, বরং সেখানে সালাহ কায়েমের পাশাপাশি নিরাশ্রয় মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন, সেখানে হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছেন। মসজিদগুলো ছিল মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র। মানুষের যেখানে থাকার ঘর নাই, সেখানে যদি মসজিদে রত্নপাথর সজ্জিত করে বলা হয় যে এটা আল্লাহর ঘর, তাহলে জনগণ বেশি দিন সেটা নিবে না। **সুলতানরা আর আলেম ওলামারা ইসলামের সর্বনাশ করেছেন এই জায়গায়। তাদের বানানো সেই সব রাজপ্রাসাদ সদৃশ মসজিদ নিয়ে আমরা বড়াই করি যদিও সেগুলো অধিকাংশই এখন অমুসলিমদের পদানত হয়ে পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আজকে যখন ছয় কোটি মুসলমান উদ্বাস্তু তখন ঐ সব টাইলস আর মার্বেল পাথরের মসজিদ, সোনার গম্বুজ আর এয়ার কন্ডিশনওয়ালা মসজিদ সব অর্থহীন হয়ে গেছে, সেগুলো আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক করছে।** তিনি গজব দিয়ে মুসলিম জাতির ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশগুলো একটা একটা করে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। কয়েক শ' বছর আগে এই যে সমস্ত মুসলিম দুনিয়ার

অধিকাংশ ভূখণ্ড ইউরোপিয়ানদের পায়ের তলার গোলামে পরিণত হয়েছিল, সেটা ছিল আল্লাহরই প্রতিশ্রুত শাস্তি, লা'নত যার কথা পূর্বে বলে এসেছি। সেই শাস্তি এখনো চলছে। হয়তো এখন তার চূড়ান্ত রূপটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যার দরুন কোটি কোটি মুসলিম ভয়াবহ অনিশ্চয়তায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিনযাপন করছে। এটা যে আল্লাহর গজব সেটা আমরা উপলব্ধিও করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি, তাই এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে বসেও নানাবিধ আমল আর জিকির আজকার করে আল্লাহর সন্তোষ হাসিল করার চেষ্টা করছি।

মুসলিমরা যখন সভ্যতার শিখরে অবস্থিত ছিল তখন বাকি বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য তারা সেখানে ছুটে যায় নি। তাদের আলেম ওলামারা দাড়ি, টুপি, কুলুখ, টাখনুর মাসলা মাসায়েলের ইসলামটি নিয়ে বসে ছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে বলেন নি যে শাসন ক্ষমতায় জনগণের অংশিদারত্ব আছে। অথচ ইসলামের নীতিই হলো নেতা জনগণের মনোনীত হতে হবে তা না হলে জাতীয় কাজ দূরে থাক, নামাজের ইমামতি করার অধিকারও সে পাবে না। জনগণ নির্বাচিত করবে তাদের নেতা কে, এটা সালাতের শিক্ষা, এই শিক্ষাই জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। গণতন্ত্র এসে এই শিক্ষা যখন মানুষকে দিল, তখন ইসলামের চিন্তাবিদরা আবিষ্কার করলেন ইসলামিক গণতন্ত্র, করজোড়ে বলতে লাগলেন, ইসলামে গণতন্ত্র আছে। **যখন সমাজতন্ত্রের বিরাট জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হলো, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে সাম্যবাদীরা নতুন পথ প্রদর্শন করল যে সকল সম্পত্তির মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের মালিক জনগণ।** কোনো বুর্জোয়া শ্রেণি থাকবে না যারা রাষ্ট্রের অধিকাংশ সম্পত্তিকে ভোগদখল করবে, সবাই হবে সমান আয়ের অধিকারী। লেনিন বললেন, Under socialism all will govern in turn and will soon become accustomed to no one governing. অর্থাৎ "সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সবাই পালাক্রমে জাতিকে পরিচালনা করবে এবং অচিরেই এমন সময় আসছে যখন মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এমন এক ব্যবস্থায় যেখানে কেউ তাদের শাসক নয়।"

ইসলামিক সমাজতন্ত্র আরেক হীনম্মন্য মতবাদঃ

জনগণ যখন সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হলো, তখন কী আর করা, আলেমরাও আবিষ্কার করলেন ইসলামিক সমাজতন্ত্র। তারা কোর'আনের দু-একটা আয়াত খুঁজে এনে তাদের এই ইসলামকে জনগণের কাছে তুলে ধরলো আর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনেক নেতা যেমন জেনারেল জিয়াউল হক, কর্নেল গাদ্দাফি, সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ ইসলামিক-সমাজতন্ত্রের ধুয়ো তুলে ক্ষমতায় আসীন হলেন এবং স্বৈরতন্ত্র কায়েম করলেন। মানুষের ঈমান আবারও হাইজ্যাক হলো। এবারও আলেম ওলামারা, যারা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেন তারা এটা বলার হিম্মৎ পেলেন না যে, ১৪০০ বছর আগে আল্লাহর রসুল যে জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেখানে জাতীয় কোষাগারের মালিক হিসাবে জনগণকেই ঘোষণা করা হয়েছিল। খলিফা কেবল তার রক্ষক ছিলেন। সত্যনিষ্ঠ খলিফাদের আমলে বায়তুল মালে কোনো সম্পদ জমা হতে পারতো না। তখন ইসলাম চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল, নতুন নতুন এলাকা

ইসলামের ছায়াতলে আসছিল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদগুলো বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে মদীনায় আসছিল। খলিফা সেই সম্পদ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়তেন। কুক্ষিগত করা দূরে থাক, মেশকাস্বর বিতরণ করার সময় নাকে কাপড় বেঁধে নিতেন যেন সুঘ্রাণ তার নাকে প্রবেশ না করে। পারস্যের রাজপ্রাসাদের সোনার ঘোড়া পর্যন্ত তিনি সংরক্ষিত না রেখে টুকরো টুকরো করে বিলিয়ে দিলেন এবং বললেন, এগুলো জনগণের সম্পদ। **এভাবে রাষ্ট্রের সম্পদকে সমস্ত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অপূর্ব সাম্যবাদী নীতি অনুসৃত হলো, যেখানে বুর্জোয়া সৃষ্টির কোনো সুযোগই রাখা হয় নি, ধনীদের সম্পদের উপর দরিদ্রের অধিকারকে নীতি হিসাবে মান্য করা হয়েছে। মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে জাতির অধিকাংশ সম্পত্তি জমা হওয়ার মূল কারণটিই হচ্ছে সুদভিত্তিক অর্থনীতি, সেই সুদের কোনো অস্তিত্বই রাখা হয় নি।** রসুলাল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্বের ভাষণের মধ্যেই আপন চাচা আব্বাসের (রা.) প্রাপ্য সকল সুদের পাওনা বাজেয়াপ্ত করেন। বরং যাকাত, ওশর, খারাজ, ফাই, ফেদিয়া, কাফফারা ইত্যাদি বহুবিধ উপায়ে সম্পদকে দুর্দাম গতিতে সঞ্চালিত করার অপূর্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আল্লাহ দান করেছেন যা সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে মাত্র কয়েক বছরের চর্চায় সম্পূর্ণ তিরোহিত করেছিল। এমন অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ঐ ভুখা নাঙ্গা আরব সমাজে কায়েম হয়েছিল যে মানুষ অর্থ নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতো কিন্তু গ্রহণকারী কাউকে খুঁজে পেত না।

প্রতিটি মানুষ যেন ন্যূনতম মানসম্পন্ন পোশাক পরিধান করতে পারে সেটা এমনভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল যে একপ্রস্থ কাপড় বেশি পরার কারণে জুমার দিনে খোতবার মধ্যে খলিফা ওমরকে (রা.) একজন নাগরিকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে। জবাবদিহিতা ও মতপ্রকাশের এই স্বাধীনতা কী সমাজতন্ত্র দিতে পেরেছিল? না। বরং সমাজতন্ত্র মানুষের মতপ্রকাশের সকল স্বাধীনতাকেই হরণ করেছিল, যার খেসারত দিতে গিয়ে সমাজতন্ত্রকেই পরিত্যক্ত হতে হয়েছে।

সমাজতন্ত্র সকলের খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে অঙ্গীকার করলেও মানুষকে রেশনের জন্য দীর্ঘলাইন ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারে নি। কিন্তু প্রকৃত ইসলাম গোটা জাতির মধ্যে খাদ্যের অভাব পুরোপুরি নির্মূল করেছিল। খলিফা ওমরের (রা.) সময় একবার খরার দরুন প্রবল খাদ্যাভাব সৃষ্টি হয়েছিল। পুরোজাতি একযোগে সেই খরা উপদ্রুত এলাকায় খাদ্য সরবরাহ করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, যতদিন ঐ খাদ্যাভাব চলছিল ততদিন খলিফা নিজেও দুধ, গোশত ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। ফলে তার শরীর জীর্ণ হয়ে চেহারায় অপুষ্টির লক্ষণ প্রস্ফূটিত হয়েছিল।

কিন্তু এই স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস যে ইসলাম রচনা করেছিল সেই ইসলামের ধারকরা বুক ফুলিয়ে এটা বলতে পারলেন না যে সমাজতন্ত্র তোমাদের অর্থনৈতিক অবিচার থেকে মুক্তি দেবে না, মুক্তি দেওয়ার মতো ব্যবস্থা আছে আমাদের কাছে। উল্টো তারা ঘোষণা দিলেন ইসলামে সমাজতন্ত্র আছে। হীনম্মন্যতা আর কাকে বলে!

চলমান বিশ্বব্যবস্থা মধ্যযুগ ও রেনেসাঁ যুগের যেসব দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের

দর্শনের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে তারা তো সেই ইসলামকে বাস্তবে দেখেন নি যে ইসলাম ক্রীতদাস বেলালকে (রা.) কাবার উর্ধ্বে উঠিয়েছিল। সেই ইসলামকে তারা দেখে নি যে ইসলামের খলিফা নিজের পিঠে আটার বস্তা নিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষের দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছেন। সেই ইসলাম তারা দেখে নি, যে ইসলামের খলিফা নিজে তার ভৃত্যকে উটের পিঠে বসিয়ে তপ্ত মরুভূমির উপর দিয়ে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করেছে। এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে অর্ধ পৃথিবীর খলিফার একজনও দেহরক্ষী ছিল না। আর দশজন নাগরিক যে মানের জীবনযাপন করতেন খলিফাও ঠিক সেটাই করতেন। তারা উন্মুক্ত স্থানে খেজুর গাছের নিচে ঘুমিয়ে দুপুরে বিশ্রাম নিয়েছেন। এভাবে বছরের পর বছর জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন। **একজন প্রশাসক তার বাড়ির দরজায় দারোয়ান রেখেছেন জানতে পেরে খলিফা তাকে পদচ্যুত করেছিলেন এবং শাস্তি দিয়েছিলেন। এমন হাজারো গৌরবময় ঘটনা প্রকৃত ইসলামের যুগকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।** কিন্তু সেই ইসলাম তো জাতি হারিয়ে ফেলেছে। ইতিহাস এক জিনিস আর বাস্তবতা আরেক জিনিস। যদি মুসলিমজাতি সেই গৌরবময় যুগের মতো শান্তি, সাম্য, নিরাপত্তা, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতার চর্চা নিজেদের শাসনাধীন দেশগুলোতে বজায় রাখতে পারতো তাহলে তাদের সেই উদাহরণ অন্য জাতিকেও আকৃষ্ট করতে সক্ষম হতো। কার্যত সেটা হয় নি বলেই মুসলিমরা সেই যুগসন্ধিক্ষণে সভ্যতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছে আর আজ পর্যন্তও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না। এখন ইসলামিক গণতন্ত্র, ইসলামিক সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নতুন নতুন মতবাদ দাঁড় করিয়ে ইসলামকে যুগের ভাষায় গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন যা তাদের হীনম্মন্যতা ও চিন্তার দৈন্যকেই প্রকাশ করে যাচ্ছে।

এখন কী করণীয়?

সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে বহুদিন হলো, গণতন্ত্রও মানবজাতির আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় মানবজাতি আবারও আদর্শের সঙ্কটে পড়েছে। কারণ তারা ধর্মকে তো জীবনব্যবস্থা হিসাবে বহু আগেই বাদ দিয়েছে, আর মানুষের তৈরি করে নেওয়া জীবনব্যবস্থাগুলোও একে একে ব্যর্থ হয়ে গেল। আদর্শের এই মহা-সঙ্কটকালে সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতার সংঘাত বা The Clash of Civilizations। এখানে মুসলিম জাতিকে পাশ্চাত্য পরাশক্তিগুলো প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা জঙ্গিবাদকে শাখের করাত হিসাবে ব্যবহার করছে। আফগান রাশিয়ার যুদ্ধ থেকে শুরু করে ইরাক, ইরান, কুয়েত, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, ফিলিস্তিন সর্বত্র চলেছে ও চলছে লাখে লাখে মুসলিম নিধন। সাড়ে ছয় কোটি মুসলমান এখন উদ্বাস্তু। **মানবজাতি একটি যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন দেশ। এমন একটি সময়ে যারা ইসলামকে মানবজাতির জন্য বিকল্প জীবনব্যবস্থা হিসাবে প্রস্তাব করতে চান তাদের ইসলামকে অবশ্যই যুগোপযোগী করেই উপস্থাপন করতে হবে।** হাজার বছর আগের সমাজের সমস্যাগুলো তার রূপ পরিবর্তন করেছে, এখন বিশ্ব অনেক এগিয়েছে, মানুষ অনেক যুক্তিশীল, চিন্তাশীল। তারা যে কোনো মতবাদকেই অন্ধভাবে আর গ্রহণ করবে এমন যুগ নেই, বিশেষ

করে ধর্মকে তো নয়ই। তারা যদি জোর করে এটা মানুষের উপরে চাপিয়ে দিতে চান সেটা কখনোই সফল হবে না। কারণ প্রথমত তাদের প্রতিপক্ষ এতটাই শক্তিশালী যে তাদের গায়ে আঁচড় কাটার ক্ষমতাও এদের হবে না। দ্বিতীয়ত, প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক তারা পারতো কিন্তু যদি আল্লাহর সাহায্য তারা লাভ করতো। কিন্তু সেটা তারা পাচ্ছে না ও পাবে না কারণ তাদের কাছে থাকা ইসলামটা আদতে ইসলামই নয় যে সেটা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ সাহায্য করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তৃতীয়ত জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার এই নীতিটা ইসলাম সমর্থন করে না, বরং এটা ইসলামের নীতি "এই দীনে কোনো জবরদস্তি নেই"- এর সরাসরি লঙ্ঘন।

তাই নিজেদের পছন্দকে মানবজাতির উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাটিকে তুলে ধরা হচ্ছে সঠিক উপায়। সেটা তাদের কাছে নেই বলেই তারা নিজেরাই আজও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নাই। অথচ আল্লাহ রসুল সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছেন দলমত নির্বিশেষে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা গড়ে তুলতে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যারা চেষ্টা করছেন তারাই হাজারো দল-মত-পথে বিভক্ত। তারাই শিয়া সুন্নী ফেরকা নিয়ে মারামারিতে ব্যস্ত। তারা কেউ হানাফি, কেউ হাম্বলি, কেউ শাফেয়ি, কেউ মালেকি। কোর'আনের মূলনীতি ত্যাগ করে বিভিন্ন মাজহাবের ফকীহ মোফাস্সেরদের তৈরি করা শরিয়তকে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া এই দলগুলো বুঝতে অক্ষম যে তাদের ওসব মাসলা মাসায়েল আর বিকোবে না। তাদেরকে এমন এক যৌক্তিক ইসলাম তুলে ধরতে হবে যা একাধারে প্রচলিত ইসলামের বিকৃতিগুলোকেও প্রকাশ করে তা থেকে মানুষকে পরিশুদ্ধ করবে, পাশাপাশি গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের অসারতাকে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরবে এবং ইসলাম কীভাবে সেগুলোর সমাধান করতে সক্ষম সে রূপরেখাও তুলে ধরতে হবে। নিজেদের বক্তব্যের, বিধানের প্রতিটি শব্দের যৌক্তিকতার প্রমাণ দিতে হবে। আরবীয় ভাষা, আরবীয় পোশাক ইসলামের নাম করে সারা দুনিয়ায় চাপিয়ে দিতে চায় যে ইসলাম তা আর কেউ নিবে না। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে, নিজস্ব সংস্কৃতি পালনের অধিকার, নিজের পছন্দনীয় পোশাক পরিধান করার স্বাধীনতা থাকতে হবে, নিজস্ব বিশ্বাস লালন ও প্রচারের অধিকার বিধিবদ্ধ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, যুগের চাহিদা মেটানোই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। তা যদি না হতো তাহলে যুগে যুগে একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসুল মানবজাতির সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান নিয়ে আসতেন না। এক নবীর মাধ্যমে পাঠানো জীবনব্যবস্থা দিয়েই কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি চলতে পারতো।

এখন যুগের চাহিদা কী? এই যুগে কীসের অভাব? প্রাচুর্যের অভাব নেই, খনিজ সম্পদের অভাব নেই, সমরাস্ত্রের অভাব নেই, জনসংখ্যার অভাব নেই। অভাব এক শক্তিশালী আদর্শের যে আদর্শ মানুষের আত্মিক চাহিদা থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের সকল বাস্তব সমস্যার সমাধান দিতে পারবে। সকল চাহিদা পূরণ করতে পারবে। এটা দিতে পারে প্রকৃত ইসলাম যা হেযবুত তওহীদ উপস্থাপন করছে।

ধর্মের বিধান সর্বযুগে গ্রহণযোগ্য হতে হবে

সময় পরিবর্তনশীল। জীবন পরিবর্তনশীল। তাই মানুষের জীবনপ্রণালী যদি সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজনমাফিক পরিবর্তন না করা হয় তাহলে একসময় সেই জীবনপ্রণালী আর মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোর উপযুক্ত সমাধান দিতে পারে না, ফলে তা মানুষের কাছে আর গৃহীত হয় না। তখন জোর করে সেটা প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়, ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, ভালোবাসা বিদ্বেষে পরিণত হয়। যেমন একটি শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তার পোশাকগুলো ছোট হয়ে যায়, নতুন পোশাক পরাতে হয়। আল্লাহ তাঁর আখেরি নবীর মাধ্যমে যে শেষ জীবনব্যবস্থাটি দিয়েছেন সেটি এমনভাবে প্রণয়ন করেছেন যা অত্যন্ত প্রাকৃতিক (Natural)। প্রকৃতি যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল তেমনি মানুষের জীবনেও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন আসে, ইসলাম সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সমানভাবে যৌক্তিক ও প্রয়োগযোগ্য থাকে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Pragmatic. **অক্সিজেন যেভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রাণবায়ু হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে, প্রকৃত ধর্ম তথা প্রকৃত ইসলামও তেমনি হাজার বছর আগে যেমন সমাজ থেকে শোষণ, বঞ্চনা দূর করতে পেরেছে তেমনি সবযুগেই পারবে। এটি হচ্ছে মৌলিক একটি সত্য। শর্ত হচ্ছে একে কোনোভাবে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যাবে না।**

কিন্তু বর্তমানে আমরা ইসলামের যে বিধানগুলো ইসলামিক পণ্ডিতদের কাছ থেকে জানতে পারছি, দেখতে পারছি সেগুলো আধুনিক সমাজের চিন্তা ও সংস্কৃতির সাথে বহুলাংশে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে। তাই ইসলামকে বহু আগেই ব্যক্তিজীবনের কিছু আনুষ্ঠানিকতার (Ritual) মধ্যে সংকীর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগে মানুষ ইসলামকে আর সামগ্রিক জীবনের প্রণালী হিসাবে গ্রহণ করছে না। ধীরে ধীরে ব্যক্তি পর্যায় থেকেও ইসলামের শিক্ষা হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু যে বিষয়গুলোর সঙ্গে উৎসব, আনন্দ, ভোগের সম্পর্ক রচনা করা গেছে সেগুলো মহাসমারোহে বাণিজ্যিক রূপ নিয়ে পালিত হচ্ছে, যেমন রোজা, ঈদ, কোরবানি, শবে বরাত, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি। ধর্মটা ওখানে টিকে আছে। কিন্তু ইসলামের মূল্যবোধগুলো সবই পশ্চিমা মূল্যবোধের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে। ব্যক্তিজীবনের আচরণ হিসাবেও ধর্ম আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে বহু আগে। কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কেন হলো?

এর কারণ হলো, আমরা কোর'আনের মৌলিক শিক্ষাগুলোকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারি নি। কোর'আন তো সারা পৃথিবীর সব ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের জন্য এসেছে, শুধু আরবের মরু পরিবেশের জন্য নয়। তাই কোর'আনে এমন একটি বিধানও নেই যা কোনো স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে অন্যত্র অকার্যকর হয়ে যায়। শুরুতেই বললাম যে ইসলামে কাঠিন্য (Rigidity) নেই, শুধু সময়ের প্রয়োজনে কিছু মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে সেটা সমাজে শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে, যুক্তিহীন ও অন্ধভাবে সওয়াবের জন্য নয়। একটি

উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আল্লাহ পোশাক পরিধান করাকে ফরদ করেছেন। সেটা কতটুকু? সেটা হচ্ছে সতর ঢাকা, অর্থাৎ লজ্জা নিবারণ করার জন্য। এরপর পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশের কথাও বলা হয়েছে। এখন নবী এসেছেন আরবে, তাই তিনি আরবীয় পোশাক পরেছেন। আল্লাহ কিন্তু আরবীয় পোশাককে ইসলামে বাধ্যতামূলক করেন নি। করলে মেরু অঞ্চলের মানুষের সেই হুকুম মান্য করা সম্ভব হতো না। এমনকি আমাদের দেশের মতো কৃষিপ্রধান নদীমাতৃক দেশের ধানচাষী ও পাটচাষীদের সারাক্ষণ কাঁদা, হাঁটুপানি-কোমর পানিতে নেমে কাজ করতে হয়। আরবীয় জোব্বা পরে সেটা কি সম্ভব? না। কিন্তু ঘটনা হয়েছে কি, পূর্ববর্তী যুগের ফকীহ, ইমাম, মুফাসসিরগণ রসুলাল্লাহর সমস্ত আচরণকেই ইসলামের মাসলা মাসায়েলের মধ্যে, বিধি-বিধানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি হলো আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করার হুকুম দিয়েছেন। আলেম ওলামারা এই অনুসরণের মানে করেছেন যে রসুলের দাড়ি ছিল, তিনি খেজুর খেতেন, তিনি পাগড়ি, জোব্বা পরিধান করতেন - তাই এগুলোও সুন্নত। এগুলোকেও তারা শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আরবের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক ইত্যাদি ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে গেছে, ঐ লেবাস না থাকলে এখন কারো ইসলামের কথা বলার অধিকারই থাকে না। এই যে শরিয়ত বা প্রথা প্রচলন করা হলো, এটা কিন্তু কোর'আনের শিক্ষা নয়, ইসলামেরও শিক্ষা নয়, এটা আলেম-ওলামা, বিভিন্ন মাজহাবের ইমামদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তৈরি করা শরিয়ত। এমন আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে। এই জন্য জাতির ঐক্য গঠনের গুরুত্বের চেয়ে লেবাসের গুরুত্ব বেশি। এই অপ্রাকৃতিক বিধানগুলোকে আল্লাহ-রসুলের বিধান বলে প্রচার করছেন ইসলামের ধারক-বাহক এক শ্রেণির আলেমগণ। অথচ ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট এলাকার সংস্কৃতিকে অন্য এলাকার মানুষের উপর জোর করে আরোপ করার পক্ষে নয়। সাংস্কৃতিক বিবর্তন একটি প্রক্রিয়া, এটিকে ঘটানো যায় না, এটি কালক্রমে ঘটে। এই মহাসত্যটি, ইসলামের এই অনন্য সৌন্দর্যটি নষ্ট করে ফেলার কারণে ইসলাম তার আবেদন সৃষ্টি করতে পারছে না। এখন সমাজের অর্থনৈতিক অবিচার, সামাজিক অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক সঙ্কট, বৈশ্বিক সঙ্কট, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, দারিদ্র্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো নিয়ে ইসলামের আলেমদের কোনো বক্তব্য নেই, সেখানে তাদের কোনো বিচরণ নেই। তারা আছেন নারীদের পোশাক কতটুকু ঢিলা হবে, প্রশ্রাব পায়খানার আগে ও পরে কী দোয়া পড়তে হবে, কুলুখ ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি কী হবে এগুলো নিয়ে। যে সময়টিতে প্রাচীন যুগের আলেমরা এই সব দোয়াকালাম রচনা করছিলেন তখন তাদের সমাজের সামষ্টিক অঙ্গনে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা কায়েম ছিল বলে সেখানে উপযুক্ত সমস্যাগুলো যথা অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবিচার, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি ছিলই না। তাদের ক্ষুরধার মেধাকে তারা এই সব মাসলা উদ্ভাবনে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু এখন মানবজাতি সমস্যায় আক্রান্ত, মুসলিম নামধারী জনগোষ্ঠীর জীবন সবচেয়ে বেশি নাজুক। এমতাবস্থায় আলেম

ওলামাদের উচিত ছিল সেই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া যার উপর সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা নির্ভর করে, সেটা অবশ্যই দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, মেসওয়াক, কুলুখ হতে পারে না। সেটা আসবে অনেক পরে, আগে জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি।

প্রকৃত ইসলামে নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিল সেটা এখন ইতিহাস হয়ে গেছে, বর্তমানের বিকৃত ইসলামে তার লেশমাত্রও নেই। তাই এখন নারী অধিকার নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা ইসলামের ঘোর বিরোধী। হবে না-ই বা কেন, শত শত বছর ধরে নারীকে ঐ সব বিকৃত ফতোয়ার বলি হয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ইসলামের নামে নারীকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে, শোষণ করা হয়েছে, অবদমিত করা হয়েছে। **কোর'আন নারী ও পুরুষকে একে অপরের সহযোগী বলে ঘোষণা দিয়েছে, সেটা অবশ্যই জীবনের সর্ব অঙ্গনে। কিন্তু ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে নারীকে সামাজিক সামষ্টিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ড থেকেই নিবৃত করা হয়েছে।**

ইসলামের নামে বহু শরিয়তি কেতাব রচনা করা হয়েছে, সেগুলো মেনে চললে মুসলিম মেয়েরা ঘর থেকেই বের হতে পারবেন না। অথচ আলেম সাহেবরা যাদেরকে কাফের বলছেন, সেই ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের মেয়েদেরকে বহু আগে মহাকাশে নিয়ে গেছে। এদেশের মেয়েরাও তাদের দেখাদেখি বিমানের ককপিটে বসছে। দুনিয়াটা অগ্রসর হয়ে এই জায়গায় এসেছে, এখান থেকে আর পেছনে যাওয়ার সুযোগ নেই। এখন ঐ মাসলার কেতাব কি এই অগ্রসর যুগের মেয়েরা মেনে নেবে?

তাহলে ইসলামকে যারা আবার তার অতীত গৌরবের অবস্থানে দেখতে চান তাদের এখন কী করণীয়? এই যুগে যদি তারা ইসলাম চান তাহলে বস্তুবাদী, ভোগবাদী সভ্যতার ধারক বাহকদের এটা বলতে হবে যে, **"তোমরা দু একটা মেয়েকে চাঁদের দেশে নিয়ে গেছো বটে কিন্তু তোমরা সমাজে থাকা নারীদের স্বাধীনতা দিতে পারো নি। স্বাধীনতা দেব আমরা।** একা একটা মেয়ে মানুষ রাতের অন্ধকারে স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত অবস্থায় হেঁটে যাবে। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, বেইজিং থেকে টরেন্টোতে। তার মনে কোনো ভয় থাকবে না। তোমাদের পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, প্রথাগত রাজতন্ত্র এই স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও অধিকার দিতে পারে নি, কিন্তু সেটা আমরা দেব।" কিন্তু আলেম সাহেবরা তো এটা বলতেই পারবেন না, কারণ তাদের নিজস্ব মতের উপর তৈরি করা শরিয়ত এ কথা বলতে দেবে না। তারা লিখেছেন, মেয়েরা ঘরে থাকবে, বাইরে গেলেও নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে যাবে। যদিও আল্লাহ সমস্ত বিশ্বে বিচরণ করার নির্দেশ দেন সেখানে নিরাপত্তার অজুহাত তুলে মেয়েদেরকে মসজিদেই যেতে দিতে নারাজ, তাহলে তারা বিশ্বের অপর প্রান্তে নারীদেরকে যেতে দেবেন কোন মাসলা মোতাবেক? ওখানেই তো প্রচলিত ইসলামের শরা-শরিয়ত শেষ। আমার প্রশ্ন, যে সমাজে দুই তিন বছরের শিশুকন্যা ধর্ষিতা হয় সেখানে পর্দা নিয়ে ওয়াজ করা গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সমাজ পাল্টানোর জন্য আলেমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ?

ধর্মের প্রয়োজন হয় জীবন চালানোর জন্য। ধর্মগুলো যখন মানুষের জীবন চালানোর

প্রণালী হিসাবে ব্যর্থ হলো তখন মানুষ বাধ্য হয়ে নিজেরা দীন রচনা করলো, ফলে মানুষ কুফর করলো। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, রাজতন্ত্র ইত্যাদি হচ্ছে সেই মানবরচিত ধর্ম যার অধীনে থেকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তার অর্থনীতি, দণ্ডবিধিসহ যাবতীয় অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলোর বিধান তৈরি করে নিচ্ছে। আল্লাহর তৈরি করা একটা বিধানও তাদের সমাজে নেই, তবু দিন থেমে থাকছে না। হতে পারে যে মানুষের রচিত এই ধর্মগুলো তাদেরকে শান্তি দিতে পারছে না, কিন্তু প্রচলিত ধর্মগুলোও তে সেই অভাব পূরণ করতে পারছে না। বর্তমানে পুঁজিবাদী শোষণের পরিণতিতে নিদারুণ অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, মাত্র ৮ জন মানুষের কাছে পুঞ্জীভূত হয়েছে দুনিয়ার অর্ধেক মানুষের সম্পদ। প্রতিটি দেশে সর্বপ্রকার অপরাধ ধাঁই ধাঁই করে বাড়ছে। রক্তের বন্যায় পৃথিবীর মাটি লাল হয়ে গেছে। কোটি কোটি মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে ইউরোপের পথে পথে ঘুরছে। অর্থনির্ভর ভোগবাদী সভ্যতায় দরিদ্র মানুষের মানবিক অধিকার ও মর্যাদা পদে পদে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। মানুষের সাথে মানুষের কোনো বন্ধনই আর অবশিষ্ট নেই, কেবল অর্থের বন্ধন ছাড়া। সন্তানকে বাবা-মা হত্যা করছে, বাবা-মাকে সন্তান হত্যা করছে।

এই যে মানবতার বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিন্তু গণতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র, কম্যুনিজমেরই ফল। এ থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য এখন নতুনরূপে মানুষকে বিকল্প কোনো নবতর আদর্শের দিকে ডাকতে হবে, মানুষকে আবারও মুক্তির পথ দেখাতে হবে, মুক্তির গান শোনাতে হবে। প্রচলিত ফতোয়ার কেতাবকে যারা ইসলাম বলে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তারা কিন্তু এমন কোনো আদর্শ মানুষকে দিতে পারেন নি, দিতে পারবেনও না। তারা বিরাট হস্তী হয়েও বাঁধা পড়ে আছেন রদ্দি মাসলা-মাসায়েলের বাঁশের খাঁচাতে, দাড়ি-টুপি-টাখনু, ঢিলা কুলুখ, ডান কাত হয়ে শুয়ে আর বিভিন্ন জনের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করতে করতেই তাদের শত শত বর্ষের গোলামের জিন্দেগি পার হয়ে যাচ্ছে। যে জাতি এখনো দাড়ি এক মুষ্টি হবে না বড় হবে, টাখনু কতটুকু দেখা যাবে, নবী নূরের তৈরি না মাটির তৈরি তা নিয়ে বিতর্ক করে, ঝগড়া করে, তাদের কাছে মানবজাতি কী আশা করবে?

এখন এই সঙ্কীর্ণ মাসলা-মাসায়েলের খাঁচার মধ্যে মানবজাতি স্বেচ্ছায় ঢুকবে না বুঝতে পেরে মোল্লাতান্ত্রিকদের একটি অংশ আবিষ্কার করেছেন জঙ্গিবাদ। কোর'আনে ঘোষিত ইসলামের মৌলিক নীতি - এই দীনে কোনো জবরদস্তি নেই, এই নীতিকেই কোরবান দিয়েছেন। অতঃপর পশ্চিমাদের ভিক্ষা দেয়া অস্ত্র বাগিয়ে গোঁয়ারের মতো প্রাচীন আলেমদের তৈরি করা তাদের সময়ে প্রযোজ্য শরিয়ত (আল্লাহর বিধান নয়) এ যুগের জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, মানছি আল্লাহ-রসুলের নামে এই অনাচার তারা করে যেতে পারবেন কেয়ামত পর্যন্ত। আর মাঝে মধ্যে জানালা খুলে দেখবেন মাহদী (আ.) বা ঈসা (আ.) আসলেন কিনা।

এই জবরদস্তি তো রহমাতাল্লিল আলামিন রসুলাল্লাহর (সা.) সুন্নাহ নয়, এটা তো হালাকু-চেঙ্গিস-তৈমুরের নীতি। এভাবে জোর করে, ভয় দেখিয়ে, হালাকু চেঙ্গিসের

নীতি অনুসরণ করে কি কোনো মহান সভ্যতা প্রতিষ্ঠা হয়? এই সব জঙ্গিবাদীদের কাজে মুসলিমরাই ধ্বংস হবে, উদ্বাস্তু হবে, তাদের নারীরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দ্বারা ধর্ষিতা হবে, তারা বারবণিতা হবে, পুরুষরা দেহব্যবসায়ী হবে - যা এখন হচ্ছে। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে বিকৃত শরিয়তপন্থীরা লড়াই করছেন তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবেন না। তারা সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে কতটা এগিয়েছে সেটা তারা ভাবতেও পারেন না, সেটা যে বিবেচ্য বিষয় সেটাও তারা বোঝেন না। তারা ভাবেন যে শুধু ধর্মীয় আবেগ দিয়েই বুঝি বিশ্বজয় করে ফেলবেন। অথচ মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো ধূলায় মিশিয়ে দিতে তাদের একটি সিদ্ধান্ত এবং এক সেকেন্ড সময় প্রয়োজন। গুড়িয়ে যে দিচ্ছে না সেটা মানবতার জন্য নয়, ১৬০ কোটি জোড়হস্ত মুসলমানের ভয়েও নয়, সেটা নিজেদের স্বার্থে। অস্ত্র বিক্রি করার স্বার্থে, সম্পদ লুট করার স্বার্থে।

তাদের দর্শন হচ্ছে জয়ী না হলে অসুবিধা নেই, জান্নাতে তো গেলাম। তারা জান্নাতে গেলেন না কোথায় গেলেন সেটা তো আর দুনিয়াবাসীরা আলমে বরজখে উঁকি দিয়ে দেখতে পারছে না। তাই অন্ধভাবেই বিশ্বাস করতে হচ্ছে। এই সুযোগে জঙ্গিরাও জান্নাতে যাচ্ছে, ঠিক বিপরীত আকিদার পীর-মুরিদরাও জান্নাতে যাচ্ছে। তারা সকলেই আত্মতৃপ্তিতে আছেন। কিন্তু আমরা বলতে চাই, যারা দুনিয়াটাকে জাহান্নাম বানিয়ে স্বার্থপরের মতো নিজেরা কানাগলি দিয়ে জান্নাতে চলে যাওয়ার চিন্তা করেন তারা জান্নাতের সুবাতাসও পাবেন না।

আজকে কেউ যদি বলেন যে "ইসলামের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলো কোর'আনের মূলনীতি বজায় রেখে বর্তমান যুগের আলোকে সংস্কার করতে হবে", এ প্রস্তাবনার পক্ষে যদি তিনি হাজারটা অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপনও করে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এই সংস্কারকার্যটি ইসলামের নীতিপরিপন্থীও নয়, এটাই স্বাভাবিক। বরং না করা হলে ইসলামেরই অবমাননা হবে, তাহলে তার বিরুদ্ধে এই ধর্মের যারা ধারক-বাহক সেজে আছেন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ফতোয়ার বাণ ছুঁড়ে মারবেন। সত্যিকার মিসাইল থেকে সেই ফতোয়ার বাণ কম শক্তিশালী নয়।

তবুও যারা ইসলামকে মানবজাতির জীবনব্যবস্থা হিসাবে দেখতে চান তাদেরকে মনে রাখতে হবে, যুগের চাহিদা মেটানোই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। তা যদি না হতো তাহলে যুগে যুগে একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসুল মানবজাতির সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান নিয়ে আসতেন না। সুতরাং মুসলিমদেরকে এখন প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ও মাসলা মাসায়েলে কেতাব থেকে বেরিয়ে বাস্তবমুখী চিন্তা করতে হবে, ইসলামকে বর্তমান যুগে গ্রহণযোগ্য, প্রয়োগযোগ্য জীবনব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। ইসলাম নিঃসন্দেহে সেই অনন্য গুণাবলীর অধিকারী।

প্রয়োজন আরেকটি রেনেসাঁ

ধর্মীয় দর্শন ও বৈজ্ঞানিক সূত্র উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের সঙ্গে অন্য সব প্রাণীর মৌলিক তফাত রয়েছে। এবং এটা সর্বজনস্বীকৃত, বৈজ্ঞানিকভাবেও স্বীকৃত। মানুষ একটি অসাধারণ সৃষ্টি। কোনো প্রাণীর প্রখর ঘ্রাণশক্তি আছে, কিন্তু তার সেরকম প্রখর দৃষ্টিশক্তি নেই। কোনো কোনো প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি সাংঘাতিক কিন্তু সে আবার বর্ণান্ধ। কারো গায়ে অনেক শক্তি কিন্তু তার শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। কিন্তু মানুষ হচ্ছে এমন এক সৃষ্টি যার মধ্যে সকল প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি সমন্বয় ঘটেছে। মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক দিয়ে সে চিন্তা করে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। আরেকটি অসাধারণ, বিস্ময়কর সত্ত্বা মানুষের মধ্যে বিরাজ করে সেটা হচ্ছে তার আত্মা যাকে কেউ বলেন বিবেক, চিন্তাশক্তি, উপলব্ধি করার ক্ষমতা, দূরদৃষ্টি, মন। আল্লাহর ভাষায় এটাই হচ্ছে রূহাল্লাহ বা আল্লাহর আত্মা যার মধ্যে আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও রয়েছে, যদিও তা অতি ক্ষুদ্র মাত্রায়। বস্তু হলে তা চোখে দেখা যায়, তার আয়তন ভর পরিমাপ করা যায়। কিন্তু যা অবস্তু যেমন কোনো সঙ্কট, তাহলে সেটা কত বড় সঙ্কট, তার ভয়াবহতা কী তা মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝতে হয়, আত্মা দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। যদি কারো সম্মানের ব্যাপার হয় তাহলে সেই সম্মানের মাহাত্ম্য, উচ্চতা উপলব্ধি করতে হয় হৃদয় দিয়ে। যে জাতির চিন্তার জগতে স্থবিরতা আসে তাদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়। কিন্তু সমাজের শিক্ষিত শ্রেণিটি আধুনিকতার অহংকারে এতটাই স্ফীত হয়ে আছে যে, তারা এই সভ্যতাকে এই সমাজকে প্রগতিশীল সমাজ বলে। কারণ এই সময়ে মানুষ এত প্রযুক্তিগত উন্নতি করেছে যা দেখে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে যে আমরা বুঝি অনেক সভ্য হয়েছি। সে একশ-দেড়শ তলা হাইরাইজ বিল্ডিং বানাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে বর্তমানের চেয়ে বেশি স্থবিরতা, এত আবদ্ধতা, এত সংকীর্ণতা মানব ইতিহাসে আগে কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ।

এটা মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে মানুষের সবচেয়ে বড় পরাজয় কখন? যখন মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। যখন দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা, মজলুমের উপর জালেমের অত্যাচার মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে না তখন তারা কীভাবে সভ্যতা ও প্রগতির অহংকার করে? আজকে মানুষ সকল অন্যায়ের কাছে দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করেছে। সে অন্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে, স্থবির হয়ে গেছে। সে তার চোখ, কান, মুখ সব বন্ধ করে ফেলেছে। মানুষ এখন মৃত। সে আর দশটা পশুর মতো কেবল জীবনধারণে ব্যস্ত।

আধুনিক এই সভ্যতার জন্ম হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর হাত ধরে। রেনেসাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। মানুষ সঙ্কট উপলব্ধি করেছিল। এজন্য ধর্মযাজকদের প্রাচীন ধ্যানধারণা, জড়ত্ব, স্থবিরতা, অন্ধত্ব, সবকিছুর মধ্যে পরকালীন শান্তির ভীতিপ্রচার, নিজেদের ঐশ্বরিকতা ইত্যাদি ধ্যান-ধারণা থেকে

বাইরে বের হবার চেষ্টা করেছে শ্বাসরুদ্ধ মানুষ। তাদের চিন্তাকে ঐ জড় ধর্মচিন্তার কারাগার থেকে বের করে এনেছে বহু জীবনের বিনিময়ে, রক্তের বিনিময়ে, বহু প্রজন্মের সম্মিলিত প্রয়াসে। সেখান থেকে বের হয়ে মানুষ দেখেছে যে না আসলেই তো আমার অনেক চিন্তার করার বিষয় আছে। সে একটা মুক্ত আকাশ পেয়েছে। এই যে চিন্তার মুক্তি তা মানুষকে নতুন একটি সভ্যতার সম্ভাবনার ঊষালগ্নে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এরই নাম তারা দিয়েছে রেনেসাঁ (renaissance), নবজাগরণ। সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-সাহিত্যের একটা স্ফূরণ ঘটে গেছে। ধর্মযাজকদের কথা ছিল তাদের কথা মানলে পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, না মানলে নরক। কথায় কথায় তারা ফতোয়া দিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে মারতো, নৃশংস উপায়ে হত্যা করতো। যারা এই রেনেসাঁর অগ্রনায়ক তাদের লক্ষ্য ছিল এই পৃথিবীটাকে তারা স্বর্গে অর্থাৎ শান্তিময় আবাসে রূপান্তরিত করবেন। একদিকে বিকশিত হলো শিল্প-সাহিত্য, প্রযুক্তি আরেকদিকে জীবন চালানোর জন্য একটার পর একটা সৃষ্টি হলো উদারনৈতিক গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আন্তর্জাতিকতাবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি। এগুলো তারা রচনা করলেন ঐ চিন্তাশক্তি দিয়ে, মস্তিষ্ককে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে। যারা করেছে তারা নিজেদের সমাজের সঙ্কটটাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই সভ্যতা বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি মানবজাতিকে এমন একটি নির্মম বাস্তবতা উপহার দিয়েছে যা অতীতের সব ভয়াবহতাকে ছাড়িয়ে গেছে। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে রেনেসাঁর যে নেটফল মানুষ লাভ করেছে তাতে তাদের সকল প্রাপ্তি অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিশ্বমানবতা সেই দানবিক শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করে নিয়েছে। এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সেই মহান রেনেসাঁ কার্যত একটি আত্মাহীন একপেশে আখেরাত-বর্জিত, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানশূন্য, ভারসাম্যহীন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে যা আসলে কোনো সভ্যতাই নয়, বরং ভোগবাদী একটি যান্ত্রিক প্রগতিমাত্র (Utilitarian Technological advancement)।

এখন যারা সমাজের সচেতন মানুষ, যারা শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, পত্র-পত্রিকা নিয়ে আছেন সবার আগে তাদেরকে বর্তমানের সঙ্কটের গুরুত্ব আত্মা দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। চিন্তা করতে হবে যে আজকের আন্তর্জাতিক সঙ্কট, জাতীয় সঙ্কট কতখানি গভীর। আজ চোখের সামনে মানুষ হত্যা হচ্ছে, অন্য মানুষ কোনো প্রতিবাদ করে না, চোখের সামনে নগর ধ্বংস হচ্ছে, মানুষ নির্বিকার টিভি দেখছে। প্রতিকারের জন্য কোনো চেষ্টা নেই। চোখের সামনে লুটপাট হচ্ছে, চাঁদাবাজি হচ্ছে কোনো প্রতিবাদ করে না, চোখের সামনে সব অন্যায় হচ্ছে মানুষ দেখছে না। ভাবছে দেখে কী লাভ? এর অর্থ মানুষ অন্যায়কারীর কাছে, শক্তিমানের কাছে আত্মসমর্পন করেছে, সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ভাবছে আমি কোনোমতে জীবনটা কাটাই। এখন এই দুর্বলকে কে জাগাবে? কে তাদের ডেকে তুলবে? কে নতুন একটি রেনেসাঁ, নবজাগরণের সূচনা করবে? কে নতুন সভ্যতার আলো ছড়াবে? শিক্ষিত মানুষ কর্পোরেট বাণিজ্যের গোলাম হয়ে গেছে। অর্থের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছে। এখন আমাদের প্রগতি নয়, অধঃগতি, এখন উন্নতি নয় পতন, আমাদের

এখন কেবল পরাজয়। আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ তো একটা পরিণতি, আমাদের সবার অথর্বতা, স্থবিরতা, নিষ্ক্রিয়তার যোগফলমাত্র। সেই ধ্বংস, পরিণতি সামনে। এখনও বুঝতে হবে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সঙ্কটটা কী। চোখে তো প্রতিদিনের বিপর্যয় দেখতেই পাচ্ছেন, আর কত দেখবেন? আর দেখার কি আছে? এরপরেও দৃষ্টি ক্লান্ত হচ্ছে না? এখনই সময় আরেকটি নবজাগরণের যে জাগরণ হবে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

ইউরোপের সেই বিপ্লব, সেই রেনেসাঁ মানবজাতিকে যা দেওয়ার তা দিয়েছে। বহু প্রযুক্তি দিয়েছে, কিন্তু মানুষকে শান্তি দিতে পারে নি। এটা পারবেও না। এখন তা শক্তির শাসনে পর্যবসিত হয়েছে। তাদের সদিচ্ছার কোনো কমতি ছিল না কিন্তু তাদের আবিষ্কৃত ফর্মুলা বা পদ্ধতিগুলো তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ দিতে পারে নি। পৃথিবীটা আজ স্বর্গের বদলে নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে, তারা একটি আত্মাহীন, মানবতাহীন, ভারসাম্যহীন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। এ সত্যটি যত দ্রুত মানুষ হৃদয়ঙ্গম করবে তত দ্রুতই তারা পরবর্তী রেনেসাঁর অভিমুখে যাত্রার সূচনা করতে পারবে। আসলেই আমাদেরকে একটি নতুন রেনেসাঁ করতে হবে, এই রেনেসাঁ হবে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যাবতীয় অসত্যের বিরুদ্ধে, যাবতীয় স্থবিরতার বিরুদ্ধে। অতীতে ধর্মের বিকৃত রূপগুলো মানুষকে স্থবির করেছিল, এখন করেছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ভোগবাদী মতবাদগুলো। ফল একটাই- কান্না, অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ ও অসহায়ত্ব।

এই যে সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি, যুদ্ধ, সংঘাত মানুষকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, তারা এসব থেকে কিছুতেই বের হতে পারছে না। মানুষ তো ধাঁই ধাঁই করে বাড়ছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মানুষ প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে আইন, নীতি-নৈতিকতা ধর্ম সবকিছুই ধ্বংস করে ফেলছে। এখনও কি শিক্ষিত সমাজ এই সঙ্কটটি উপলব্ধি করবেন না? যারা ঘরের কাছেই নিপীড়িত জনতার চিৎকার শুনে না, শুনলেও নিজেদের ধারণকৃত ব্যবস্থার জালে অসহায় বন্দীর মত চেয়ে থাকতে বাধ্য, কিছু করতে অক্ষম, যারা পাশের বাড়ির মানুষের চিৎকার শুনে না, এরা বধির, এরা মৃত। মানবসভ্যতাকে এই স্থবিরতা থেকে, মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধারের একদিন রেনেসাঁ হয়েছিল। সেই মানুষগুলো পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ ছিল, কিন্তু এখনকার মানুষ সক্রিয়ভাবে পরিবর্তনও চায় না। তাদের চেতনা নেই, বোধ শক্তি নাই। খাচ্ছে দাচ্ছে টিভি দেখছে যেন সব কিছু স্বাভাবিক আছে।

প্রগতি অতীতকে অস্বীকার করে না, অতীতে ফিরেও যায় না। সে অতীতকে মূল্যায়ন করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সময়ের পরিবর্তনে মানুষের মননশীলতার সঙ্গে মানানসই, কালের প্রয়োজন পূরণ করার মত ব্যবস্থা নিয়েই যুগে যুগে নবী-রসুলদের আগমন হয়েছে। না হলে একজন নবী দিয়েই কাজ চলত। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসুল এসেছেন মানুষকে প্রগতির শিক্ষা দেয়ার জন্য, মানুষকে পিছনে ফেরানোর জন্য নয়। কিন্তু এখন আমরা পেছন দিকে হাঁটছি। আমরা অহঙ্কার করি আদিম সমাজে নাকি জোর যার মুল্লুক তার ছিল। এখনকার কথিত আধুনিক

প্রগতিশীল সমাজে মুল্লুক কার? আমরা তো অতীতেই ফিরে গেছি। আপনারা উঁচু টাওয়ারের অহঙ্কার করেছেন। উঁচু উঁচু টাওয়ার অতীতের অনেক সভ্যতাই বানিয়েছিল। পিরামিড বানিয়েছিল, ঝুলন্ত বাগান বানিয়েছিল। সেই সব উঁচু টাওয়ার অভিশাপ হলো কেন, পর্যটকদের দর্শনীয় পরিত্যক্ত স্থান হলো কেন? কারণ উন্নতি প্রগতি যখন অহঙ্কারের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় তখন তা অভিশাপে পরিণত হয়। এই আধুনিক সভ্যতার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অহঙ্কারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাবধান! অতীত থেকে শিখুন।

ইউরোপের রেনেসাঁর আগের রেনেসাঁটি ঘটিয়েছিলেন আল্লাহর শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.)। তিনি আরব জাতিকে জাহেলিয়াতের বন্দীদশা, কূপমণ্ডূকতা থেকে এমন এক হ্যাঁচকা টানে বের করে আনলেন যে সেই অশিক্ষিত মূর্খ আরবরা জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হল। তাদের চিন্তাশক্তি এতটাই গতিশীল হলো যে, তারা রসায়ন, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রযুক্তি, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা, স্থাপত্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিশাল ভূমিকা রাখলেন, হাজার হাজার মহামূল্যবান বই রচনা করলেন। বহু নতুন ভূখণ্ড তারা আবিষ্কার করলেন। সামরিক শক্তিতে তারা ছিলেন অপরাজেয়, রোমান পারস্যের মতো হাজার বছরের পুরনো শক্তিও তাদের সামনে শুকনো পাতার মতো উড়ে গিয়েছিল। উরাল পর্বত, কারাকোরাম, কিরঘিজ পর্বতের শিখরে তাদের পতাকা উড়ল। সেই আরবজাতি যারা কিছুদিন আগেও ছিল চিন্তাহীন, অথর্ব, চুরি-ডাকাতি আর কামড়া-কামড়িতে ব্যস্ত, ছিল অন্যায়কারী, অন্যায়ের সাথে আপসকারী ভীরু কাপুরুষ, তাদেরকে আল্লাহর রসুল দুঃসাহসী যোদ্ধা ও অর্ধ দুনিয়ার শাসক জাতিতে পরিণত করলেন, তারাই বিশ্বের বুকে সবচেয়ে আলোকিত, মহিমান্বিত, সমৃদ্ধ জাতিরূপে আবির্ভূত হলো। ইতোপূর্বে তারা ধর্ম বলতে বুঝত কাঠ পাথরের মূর্তি পূজা আর মন্ত্রপাঠ অর্থাৎ সংকীর্ণ গণ্ডিতে, স্থবির জড়বস্তুর মধ্যে মানুষের অপার চিন্তাশক্তিকে আড়ষ্ট, আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। মানবজীবন প্রচণ্ড গতিময়, ধর্মও যদি তদ্রূপ গতিময় না হয় তাহলে তা পরিত্যক্ত হবেই, মানুষ তা বেশিদিন বহন করতে পারবে না, এটা প্রাকৃতিক। রসুলাল্লাহ (সা.) তাদেরকে কী ধর্ম শেখালেন? না, স্থবির উপাসনা নয় বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচারী শাসকের জুলুম থেকে রক্ষা করা, ন্যায়ের স্থাপনা করা, এটাই তোমাদের ধর্ম, এটাই তোমাদের এবাদত। শেখালেন দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই আরবরা নিজেদের সুপ্তসত্তাকে জাগ্রত করলেন, অনুভব করলেন তাদের মধ্যে অপার সম্ভাবনা লুকায়িত আছে। তারা নিজেদেরকে নতুনরূপে আবিষ্কার করলেন, বিশ্বের ইতিহাসকে পাল্টে দিলেন। আরবজাতির এ নবজাগরণ সম্বন্ধে, স্থবিরতার পরিবর্তে আলোড়ন সৃষ্টির নেপথ্য কারণ বলতে গিয়ে ইতিহাসবেত্তা Lothrop লিখেছেন- Forgetting the chronic rivalries and blood feuds which had consumed their energies is internecine strife, and welded into a glowing unity by the fire of their new found faith, the Arabs poured forth from their

deserts to conquer the earth for Allah the One true God (The New World of Islam- Lothrop). অর্থাৎ "যে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পুরুষাণুক্রমিক রক্তাক্ত বিবাদের দরুন ও আত্মকলহে তাদের শক্তি নিঃশেষ হচ্ছিল তা ভুলে যেয়ে এবং নতুন বিশ্বাসের আগুনে উজ্জ্বল ঐক্যে দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে আরবরা তাদের মরুভূমি থেকে বানের ঢলের মত নির্গত হলো- এক এবং সত্য অল্লাহর জন্য পৃথিবী জয় করতে।" কথা হলো, রসুলাল্লাহর সৃষ্ট এই রেনেসাঁ কিন্তু ইউরোপীয় রেনেসাঁর মতো আত্মাহীন, ভারসাম্যহীন, কেবল বস্তুতান্ত্রিক ছিল না। সেটা ছিল শরিয়াহ ও মারেফাত তথা দেহ-আত্মা, দুনিয়া-আখেরাতের ধারণার সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced) সভ্যতা। যে সভ্যতা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছিল, সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করেছিল, কিন্তু পুঁজিবাদের শোষণ সেখানে ছিল না, অধিকাংশ মানুষ নৈতিক মূল্যবোধে, আত্মিক মানবিক গুণাবলীতে আলোকিত মানুষে পরিণত হয়েছিল। কালেভদ্রে কেউ অপরাধ করলে নিজে গিয়ে আদালতে নিজের প্রায়শ্চিত্যের জন্য শাস্তি কামনা করত, তাকে ধরে আনার জন্য পুলিশ গোয়েন্দাবাহিনী কিছুই প্রয়োজন পড়ত না। অর্থাৎ মানুষের ভেতরে বাইরে আমূল পরিবর্তন করল। এটাই হলো প্রকৃত বিপ্লব, প্রকৃত রেনেসাঁ। সেই যে রেনেসাঁ সৃষ্টি করে দিলেন রসুলাল্লাহ সেটার ধাক্কা কয়েক শতাব্দী চলল। আবার যখন এই উম্মাহতে ভারসাম্য নষ্ট হলো, রাজা বাদশাহরা ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে গেল, একদিকে ভারসাম্যহীন সুফিবাদ জাতির সংগ্রামী বহির্মুখী চরিত্রকে অন্তর্মুখী করে দিল, গতিশীল জাতিকে স্থবির করে দিল; অপরদিকে আলেম মুজতাহিদ, মোফাসসেররা দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লক্ষ লক্ষ মাসলা মাসায়েল উদ্ভাবন করে জাতিকে বহু ফেরকা, মাজহাবে বিভক্ত করে ফেলল এবং সহজ সরল দীনকে এমনভাবে মাকড়সার জালের ন্যায় জটিল ও দুর্বোধ্য করে ফেলল যে তা সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে চলে গেল। দীনের ভারসাম্য নষ্ট হল। এভাবে জাতিকে পঙ্গুত্ব পেয়ে বসল, তারা অন্তর্মুখী জড় হয়ে গেল। তারপর থেকে তাদের উপর আবার গজব শুরু হলো যা এখনও চলছে।

এখন আমরা হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করছি আবারও একটি রেনেসাঁ, নবজাগরণের সূচনা করতে, মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটাতে। বুদ্ধি, চিন্তা, আত্মা, দৃষ্টি, বিবেক খুলে দিতে। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে সঙ্কটের গভীরতা। তাকে জাগতে হবে, এই গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার পথ সন্ধান করতে হবে।

হুজুগনির্ভর ধর্মোন্মাদনা ইসলামে নেই

আধুনিক জ্ঞানে-বিজ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি, প্রযুক্তির এই যুগে এসে যখন তথ্য যাচাই বাছাইয়ের অবাধ সুযোগ মানুষের হাতের মুঠোয়, এমন একটি পর্যায়ে মানবজাতি পৌঁছানোর পর মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীকে কতগুলো বিষয় অনুধাবন করতে হবে। যুক্তিশীল মানুষের কাছে ইসলামের আবেদন হারানোর অন্যতম কারণ এখনও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে গুজব শুনে হুজুগে মেতে ওঠার ব্যাপক প্রবণতা। এমন কি অধিকাংশ মুসলিম সেই সংবাদটির সত্য-মিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজনীতাও বোধ করে না। অথচ এটা সরল সত্য যে গুজব বা হুজুগ কখনওই কোনো শুভফল বয়ে আনতে পারে না। বরং এ দুটোকে ব্যবহার করে সর্বযুগে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে কিছু মহল। ভাবতে অবাক লাগে মুসলমানেরা কী করে হুজুগ আর গুজবে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো! একটা গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় আর মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ হৈ হৈ রৈ রৈ করে ধ্বংসাত্মক ও সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এতে বদনাম হয় ধর্মের, অবমাননা হয় আল্লাহর, রসুলের। **রসুলাল্লাহ এক মহান রেনেসাঁ সংঘটন করে শত শত বছর দীর্ঘস্থায়ী একটি স্বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতা নির্মাণ করেছিলেন, সেটা হুজুগের দ্বারা, গুজবের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তিনি এমন লঘুস্বভাবের মানুষ ছিলেন না যে ক্ষণস্থায়ী একটি উত্তেজনা সৃষ্টি করে কার্যসিদ্ধি করে নিবেন।** আইয়্যামে জাহেলিয়াতের আরবজাতি অযৌক্তিক বিষয় নিয়ে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গোত্রীয় হানাহানি, রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে গেছে। এ রকম অর্থহীন কাজকে বন্ধ করে মানুষকে সভ্য বানানোর জন্যই ইসলাম এসেছিল। কিন্তু রসুলাল্লাহর বিদায়ের ১৪০০ বছর পর আমরা দেখি ফেসবুকে প্রচারিত একটি গুজবকে বা বানোয়াট ছবিকে কেন্দ্র করে আমাদের আলেম দাবিদার গোষ্ঠীটি ধর্মবিশ্বাসী মানুষদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের বিরুদ্ধে বিরাট দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিচ্ছেন যেখানে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটছে, উপাসনালয় ভাঙচুর হচ্ছে, মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়া হচ্ছে। ইসলামের নাম করে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। কী দুর্ভাগ্য আমাদের!

শোনা কথায় কান দিয়ে আকস্মিক আবেগের বশে কোনো কাজ করা আল্লাহর সরাসরি নিষেধ, ইসলাম এর ন্যূনতম সম্ভাবনাকেও প্রশ্রয় দেয় না বরং নির্মূল করে দেয়। উড়ো কথা প্রচার করা বা কারো উপর অপবাদ আরোপ করা ইসলামের দৃষ্টিতে দণ্ডনীয় অপরাধ। কারো ব্যাপারে কোনো কথা শুনে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে প্রচার করা সমাজে বিশৃঙ্খলা বিস্তারের অন্যতম কারণ।

১. আল্লাহ বলেছেন- মো'মেনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও (সুরা হুজরাত-৬)।

২. আল্লাহ এটাও বলেছেন যে, হে মো'মেনগণ! তোমরা অধিকাংশ বিষয়ে অনুমান

করা থেকে বিরত থাকো, কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ (সুরা হুজরাত ১২)।

৩. অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, যারা অজ্ঞতা ও উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে (সুরা যারিয়াত ১০)।

৪. আল্লাহর রসুল বলেছেন, তোমরা ধারণা-অনুমান থেকে বেঁচে থাক কারণ ধারণা-অনুমান সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা (বোখারি ৬০৬৬, ৬৭২৪, মুসলিম: ৬৪৩০)।

৫. আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, কোনো মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাই শোনে তাই যাচাই না করেই অন্যের কাছে বর্ণনা করে দেয়।" (হাদীস-মুসলিম)।

রসুলাল্লাহর জীবনে এমন একটি ঘটনাও নেই যেখানে সাহাবীরা গুজবে মেতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করেছেন। এমন কি যুদ্ধের সময়ও তারা অত্যন্ত সতর্ক থেকেছেন যেন কোনো নির্দোষ বেসামরিক ব্যক্তি, নারী, শিশু, বৃদ্ধের উপর আঘাত না লাগে। কোনো ক্ষেত্রে যেমন মক্কা বিজয়ের সময় কিছু লোককে খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ভুল করে হত্যা করে ফেলেন। খবর জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রসুল (সা.) আল্লাহর দরবারে নিজেকে এই ঘটনার সাথে অসম্পৃক্ত বলে ঘোষণা করেন এবং খালেদের এই ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চান। তারপর নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন এবং তাদের কাছেও ক্ষমা চান। বিজয়ী সেনাপতি কখনো ক্ষমা চায় এমন ইতিহাস মানবজাতির জীবনে আর আছে? সেদিন মক্কাবাসী ছিল অসহায়। **রসুলাল্লাহ যদি প্রতিশোধ চাইতেন কী অবস্থা হতো মক্কাবাসীর? একদম মাটির সাথে পিষে ফেলতে পারতেন, সবার বাড়িঘর ভস্মীভূত করে দিতে পারতেন। কিন্তু রসুল তা করেন নি।** তিনি দাঙ্গাবাজ ছিলেন না, তিনি ছিলেন যোদ্ধা। তিনি চিরকাল নিজের সেনাবাহিনীর চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন আর দুর্বল শত্রুকে ক্ষমা করেছেন, এটাই তাঁর জীবনে আমরা বার বার দেখতে পাই। এটাই হচ্ছে বীরত্বের নিদর্শন। বীর যুদ্ধ করে, কাপুরুষ দাঙ্গা করে।

মিথ্যার সুযোগ না নেওয়ার দৃষ্টান্ত:

আল্লাহর রসুল (স.) যে একজন সত্যনিষ্ঠ মহামানব ছিলেন এবং তিনি তাঁর জীবনে মিথ্যার ভিত্তিতে, গুজবের ভিত্তিতে, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন নি তার প্রমাণ হিসাবে আরেকটা ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো। মদিনায় তাঁর ৩ বছরের ছেলে ইব্রাহীম যেদিন ইন্তেকাল করলেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হলো। আরবের নিরক্ষর, অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মনে এই ধারণা জন্মাল যে, যার ছেলে মারা যাওয়ায় সূর্যগ্রহণ হয়, তিনি তো নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল, না হলে তাঁর ছেলের মৃত্যুতে কেন সূর্যগ্রহণ হবে? কাজেই চলো, আমরা তাঁর হাতে বায়াত নেই, তাঁকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে নেই, তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করি।

তাদের এ মনোভাব মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল। আল্লাহর রসুল (সা.) যখন একথা শুনতে পেলেন, তিনি নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে লোকজন ডাকলেন এবং বললেন, **"আমি শুনতে পেলাম তোমরা অনেকেই বলছ, আমার ছেলে ইব্রাহীমের ইন্তেকালের**

জন্য নাকি সূর্যগ্রহণ হয়েছে। এ কথা ঠিক নয়। ইব্রাহীমকে আল্লাহ নিয়ে গিয়েছেন আর সূর্যগ্রহণ একটি প্রকৃতিক নিয়ম। এর সাথে ইব্রাহীমের মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই।" (হাদীস, মুগীরা ইবনে শো'বা ও আবু মাসুদ (রা.) থেকে বোখারী)।

ঘটনাটি এমন এক সময়ের যখন মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড টানাপড়েন ও বিতর্ক চলছে যে তিনি আসলেই আল্লাহর রসুল কি রসুল নন। এমতাবস্থায় রসুলাল্লাহ কিছু না বলে যদি শুধু চুপ করে থাকতেন, কিছু নাও বলতেন, দেখা যেত অনেক লোক তাঁর উপর ঈমান এনে ইসলামে দাখিল হতো, তাঁর উম্মাহ বৃদ্ধি পেত - অর্থাৎ যে কাজের জন্য আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন সেই কাজে তিনি অনেকটা পথ অগ্রসর হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এসেছিলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে, তাই মিথ্যার সাথে এতটুকুও আপস করলেন না। এতে তাঁর নিজের ক্ষতি হলো। কিন্তু যেহেতু এ কথা সত্য নয় গুজব, সত্যের উপর দৃঢ় অবস্থান থাকার কারণে তিনি সেটিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিলেন না। তিনি শক্তভাবে এর প্রতিবাদ করলেন, তিনি জনগণের ধারণাকে সঠিক করে দিলেন। নিজের স্বার্থে তাদের ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করলেন না বা হতে দিলেন না।

এটাই ইসলাম। এটাই আল্লাহর রসুলের প্রকৃত আদর্শ। সে আদর্শ থেকে সরে গিয়ে অর্থাৎ হেকমতের দোহাই দিয়ে বা যে কোনো অজুহাতে মিথ্যার সাথে আপস করে যতই নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক দল, সংগঠন, আন্দোলন পরিচালনা করা হোক, লাখ লাখ কর্মীবাহিনী তৈরি করা হোক, সফলতা আসবে না, আখেরে মিথ্যাই বিজয়ী থাকবে।

আরবরা ছিল পৃথিবীর অন্যতম অজ্ঞ, শিক্ষাবঞ্চিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠী। একবার মদিনায় একটি প্রচণ্ড শব্দ হলো। সেটা কিসের শব্দ তা কেউ বুঝতে পারল না। মদিনার লোকেরা ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে বিভিন্ন ধরনের শঙ্কার উদয় হলো, কেউ ভাবল শত্রু আক্রমণ করেছে, কেউ বা একে আসমানী গজবের আলামত মনে করল। লোকেরা সেই আওয়াজের দিক লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে লাগল। একটু এগিয়েই তারা দেখতে পেল যে নবী করিম (সা.) সেই দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছেন। তিনি অভয় দিয়ে বললেন, "সবকিছু স্বাভাবিক আছে। তোমরা কোনো চিন্তা করো না।" **আওয়াজটি রসুলাল্লাহর কানে যাওয়া মাত্রই কালবিলম্ব না করে তিনি একাই ঘোড়া ছুটিয়ে সেদিকে রওয়ানা দেন এবং নিজ জনগোষ্ঠীকে আশ্বস্ত করেন। ঘোড়ার পিঠে রেকাব বা জিন যুক্ত করার সময়টিও তিনি নষ্ট করেন নি** (হাদিস: আনাস রা. থেকে বোখারী)। এভাবে তিনি তাঁর জনগণের মধ্যে কোনো প্রকার গুজবের বিস্তার ঘটার কোনো সুযোগ দিলেন না, ঘটনাটিকে রাজনৈতিক স্বার্থেও ব্যবহার করলেন না। এমন একজন মহান ব্যক্তির অনুসারী হয়ে কী করে উম্মতে মোহাম্মদী বর্তমানের ন্যায় এহেন অযৌক্তিক ও গুজবনির্ভর জনতা হয়ে গেল? কী তাদের এমন অন্ধ আবেগে উন্মাদনাপ্রবণ করে তুললো?

এই ঘটনায় রসুলাল্লাহর সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, নিজেকে অজানা

বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে জাতিকে নিরাপত্তা প্রদানের যে অঙ্গীকার তিনি করেছেন তাঁর প্রতি ঐকান্তিক দায়বদ্ধতার নিদর্শনও এ ঘটনায় ফুটে ওঠে। আতঙ্ক বিস্তার করে স্বার্থ আদায় করা ইসলামের বৈশিষ্ট্য নয় সেটা নবী স্বয়ং প্রমাণ দিলেন। অথচ বর্তমানে কেবল আতঙ্ক বিস্তারের জন্য ইসলামিক জঙ্গিরা হোটেলে খেতে আসা নিরীহ সাধারণ মানুষকে রাতভর জবাই করছে, মধ্যপ্রাচ্যে অসংখ্য মানুষকে জবাই করার বীভৎস দৃশ্য ভিডিও করে তা অনলাইনে প্রচার করছে, যেন তাদের নৃশংসতা দেখে মানুষ শিউরে ওঠে। এসব ভয়াবহ বিকৃত চিন্তাভাবনাকে তারা আবার বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল দেখিয়ে ইসলামসম্মত বলে প্রচারও করছে। তাদের এসব কাজের ফলে ইসলাম কেবল অমুসলিম নয়, মুসলিমদের কাছেও আবেদন হারাচ্ছে।

আবেগ নয়, যুক্তিঃ

ইসলাম এমন একটি দীন যার মধ্যে অন্ধবিশ্বাসের জায়গা নেই। আল্লাহ মানুষকে মস্তিষ্ক দিয়েছেন যেন সে চিন্তা করে। মস্তিষ্কের এই ক্ষমতা পশুকে দেওয়া হয় নি। তাকে হৃদয় দেওয়া হয়েছে অনুধাবন করার জন্য, এটা পশুকে দেওয়া হয় নি। মানুষকে চোখ দেয়া হয়েছে দেখার জন্য, কান দেয়া হয়েছে শোনার জন্য। সে কেন দেখবে না? সে কেন শুনবে না? সে কেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করে দেখবে না? যদি না করে তাহলে এগুলো দেওয়া অর্থহীন হয়ে গেল। সুতরাং একজন মো'মেন (সত্যধারণকারী ও সত্য প্রতিষ্ঠাকারী) কখনও অন্ধের মতো কাজ করতে পারে না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহর রসুল মোহাম্মদ (দ.) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পূরণ করার জন্য যে জাতিটি তৈরি করেছিলেন সেই জাতির ইসলাম সম্পর্কে আকিদা (Comprehensive Concept, সামগ্রিক ধারণা) আর বর্তমানের পৃথিবীজুড়ে মৃত দেহের মতো পড়ে থাকা লাঞ্ছিত, বহুধাবিভক্ত এ জাতির আকিদার মাঝে আকাশ পাতালের ফারাক বিদ্যমান। ধর্মজীবী তথাকথিত আলেম, পুরোহিত শ্রেণির খপ্পরে পড়ে দীন আজ বিকৃত এবং বিপরীতমুখী আকার ধারণ করেছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এমন কোন বিষয় নেই যেখানে এই বিকৃতি পৌঁছায় নি। আর এরই ধারাবাহিকতায় দীন আজ অন্ধ বিশ্বাসের অলীক ধ্যান-ধারণায় পরিণত হয়েছে। বাস্তবে ইসলাম কোনো অন্ধভাবে বিশ্বাসের যোগ্য বিষয় নয়, প্রকৃত ইসলাম যুক্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর তাই যুক্তি দিয়েই ইসলামকে নিরীক্ষণ করতে হয়। আল্লাহর কোর'আন যিনি ভাসাভাসাভাবেও একবার পড়ে গেছেন তিনিও লক্ষ না করে পারবেন না যে, চিন্তা-ভাবনা, যুক্তির উপর আল্লাহ কত গুরুত্ব দিয়েছেন। "তোমরা কি দেখ না? তোমরা কি চিন্তা করো না?" এমন কথা কোর'আনে এতবার আছে যে সেগুলোর উদ্ধৃতির কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এখানে শুধু দু'একটি কথা বলছি এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য। চিন্তা-ভাবনা, কারণ ও যুক্তির উপর আল্লাহর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে এই দীনে অন্ধ বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। তারপরও তিনি সরাসরি বলছেন- **"যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই (অর্থাৎ বোঝো না) তা গ্রহণ ও অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই তোমাদের শোনার, দেখার ও উপলব্ধির প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে প্রশ্ন করা হবে (সুরা বনি ইসরাইল ৩৬)।"** কোর'আনের এ আয়াতের কোন ব্যাখ্যা

প্রয়োজন পড়ে না। অতি সহজ ভাষায় আল্লাহ বলছেন জ্ঞান, যুক্তি-বিচার না করে কোনো কিছুই গ্রহণ না করতে।

অন্য বিষয়ে তো কথাই নেই, সেই মহান স্রষ্টা তাঁর নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোর'আনে বহুবার বহু যুক্তি দেখিয়েছেন। তারপর তাঁর একত্ব, তিনি যে এক, তাঁর কোনো অংশীদার, সমকক্ষ নেই, অর্থাৎ একেবারে তাঁর ওয়াহদানিয়াত (একত্ব) সম্পর্কেই যুক্তি তুলে ধরেছেন। বলছেন- "বল (হে মোহাম্মদ), মুশরিকরা যেমন বলে তেমনি যদি (তিনি ছাড়া) আরও হুকুমদাতা (এলাহ) থাকতো তবে তারা তাঁর সিংহাসনে (আরশে) পৌঁছতে চেষ্টা করতো (সুরা বনি ইসরাইল ৪২)। আবার বলছেন- "আল্লাহ কোনো সন্তান জন্ম দেন নি; এবং তাঁর সাথে আর অন্য কোনো হুকুমদাতা নেই, যদি থাকতো তবে প্রত্যেকে যে যেটুকু সৃষ্টি করছে সে সেইটুকুর পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং অবশ্যই কতগুলি হুকুমদাতা অন্য কতকগুলির হুকুমদাতার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো (সুরা মো'মেনুন ৯১)।" এমনি আরও বহু আয়াত উল্লেখ করা যায় যেগুলিতে আল্লাহ মানুষের জ্ঞান, বিবেক, যুক্তির, চিন্তার প্রাধান্য দিয়েছেন, সব কিছুতেই ঐগুলি ব্যবহার করতে বলেছেন, চোখ-কান বুঁজে কোন কিছুই অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ যেমন একেবারে তাঁর নিজের অস্তিত্ব ও একত্বের ব্যাপারেও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তেমনি তাঁর রসুল (দ.) আলী (রা.) এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, **'আমার ঈমানের ভিত্তি ও শেকড় হলো যুক্তি** - Reason is the root of my faith. (কেতাবুশ শেফা, ভলিউম ১, পৃঃ ৮৭, The Life of Muhammad- Muhammad H. Haykal)। এরপর ইসলামে আর অন্ধ বিশ্বাসের কোন জায়গা রইল কোথায়?

অন্ধবিশ্বাস তো দূরের কথা আল্লাহ ও রসুলের (দ.) প্রেমে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েও যে যুক্তিকে ত্যাগ করা যাবে না, তা তাঁর উম্মাহকে শিখিয়ে গেছেন মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। একটি মাত্র শিক্ষা এখানে উপস্থাপন করছি।

উহুদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তাঁর তলোয়ার উঁচু করে ধরে বিশ্বনবী (দ.) বললেন- "যে এর হক আদায় করতে পারবে সে এটা নাও।" ওমর বিন খাত্তাব (রা.) লাফিয়ে সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন-"ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে দিন, আমি এর হক আদায় করব।" মহানবী (দ.) তাঁকে তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার বললেন- "যে এর হক আদায় করতে পারবে সে নাও।" এবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবা যুবায়ের বিন আল আওয়াম (রা.) লাফিয়ে এসে হাত বাড়ালেন- "আমি এর হক আদায় করব।" আল্লাহর রসুল (দ.) তাকেও তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার ঐ কথা বললেন, এবার আনসারদের মধ্যে থেকে আবু দোজানা (রা.) বিশ্বনবীর (দ.) সামনে এসে প্রশ্ন করলেন- "হে আল্লাহর রসুল! এই তলোয়ারের হক আদায়ের অর্থ কী?" রসুলাল্লাহ জবাব দিলেন- **"এই তলোয়ারের হক হচ্ছে এই যে এটা দিয়ে শত্রুর সঙ্গে এমন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করা যে এটা দুমড়ে, ভেঙ্গে চুরে যাবে।"** আবু দোজানা (রা.) বললেন- "আমায় দিন, আমি এর হক আদায় করব।" বিশ্বনবী (দ.) আবু দোজানা (রা.) হাতে তাঁর তলোয়ার উঠিয়ে দিলেন (হাদিস ও

সীরাতে রসুলাল্লাহ- মোহাম্মাদ বিন ইসহাক)।

একটা অপূর্ব দৃষ্টান্ত, শিক্ষা যে, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগের চেয়ে ধীর মস্তিষ্ক, যুক্তির স্থান কত ঊর্ধ্বে। ওমর (রা.) ও যুবায়ের (রা.) এসেছিলেন আবেগে, স্বয়ং নবীর (দ.) হাত থেকে তাঁরই তলোয়ার! কত বড় সম্মান, কত বড় বরকত ও সৌভাগ্য। ঠিক কথা, কিন্তু আবেগের চেয়ে বড় হলো যুক্তি, জ্ঞান। তারা আবেগে ও ভালোবাসায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন যে, মহানবী (দ.) যে হক আদায় করার শর্ত দিচ্ছেন, সেই হকটা কী? আবু দোজানার (রা.) আবেগ ও ভালোবাসা কম ছিল না। কিন্তু তিনি আবেগে যুক্তিহীন হয়ে যান নি, প্রশ্ন করেছেন- কী ঐ তলোয়ারের হক? হকটা কী তা না জানলে কেমন করে তিনি তা আদায় করবেন? বিশ্বনবী (দ.) যা চাচ্ছিলেন আবু দোজানা (রা.) তাই করলেন। **যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করলেন এবং তাকেই তাঁর তলোয়ার দিয়ে সম্মানিত করলেন।** এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যুক্তিকে প্রাধান্য না দেওয়ায় মহানবী (দ.) প্রত্যাখ্যান করলেন কাদের?

একজন তাঁর শ্বশুর এবং ভবিষ্যৎ খলিফা, অন্যজন শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের অন্যতম এবং দু'জনেই ঐতিহাসিকদের হিসাব মোতাবেক আশআরা মোবাশশারার অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে আবু দোজানা (রা.) এসব কিছুই নন, একজন সাধারণ আনসার। তবু যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়ায় ঐ মহা সম্মানিত সাহাবাদের বাদ দিয়ে তাঁকেই সম্মানিত করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে- আবু দোজানার (রা.) আবেগ, বিশ্বনবীর (দ.) প্রতি তার ভালোবাসা কি ওমর (রা.) বা যুবায়েরের (রা.) চেয়ে কম ছিল? না, কম ছিল না, তার প্রমাণ বিশ্বনবীর (দ.) দেয়া তলোয়ারের হক তিনি কেমন করে আদায় করেছিলেন তা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। ওহুদের দিন কেউ আবু দোজানার (রা.) সামনে দাঁড়াতে পারে নি। যুদ্ধের পর রসুলাল্লাহ স্বয়ং আবু দোজানার (রা.) বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি সেদিন আলীর (রা.) সমতুল্য বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন।

যেখানে একজন সাহাবী তলোয়ারের হক কী সেটা জিজ্ঞেস করে না জেনে নেওয়া পর্যন্ত রসুলাল্লাহ তাকে সেটা হস্তান্তর করেন নি, এটি যখন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, আল্লাহর শিক্ষা, সেখানে কী করে এ জাতি অন্ধবিশ্বাসে পা বাড়ালো? এই অন্ধত্বই হলো যুগে যুগে সভ্যতাগুলোর ধ্বংসের কারণ।

বে-আক্কেলের মতো সওয়াবের আশায় করা আমল অর্থহীনঃ

ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন- আল্লাহর রসুল (দ.) বললেন- 'কোনো মানুষ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ওমরা (ইবনে ওমর (রা.) উল্লেখ করছেন যে ঐগুলি তিনি একে একে এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, মনে হলো কোন আমলের কথাই তিনি (দ.) বাদ রাখবেন না) ইত্যাদি সবই করল কিন্তু কেয়ামতের দিন তার 'আকলের' বেশি তাকে পুরস্কার দেয়া হবে না (হাদিসঃ ইবনে ওমর (রা.) থেকে- আহমদ, মেশকাত)। রসুলাল্লাহ (দ.) শব্দ ব্যবহার করেছেন 'আকল', যে শব্দটাকে আমরা বাংলায় ব্যবহার করি 'আক্কেল' বলে, অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, যুক্তি ইত্যাদি, আবু দোজানা (রা.) যেটা ব্যবহার করে নবীকে (দ.) প্রশ্ন করেছিলেন

তলোয়ারের কী হক? অর্থাৎ বিচারের দিনে মানুষের আমলের সওয়াবই শুধু আল্লাহ দেখবেন না, দেখবেন ঐ সব কাজ বুঝে করেছে, নাকি ইতর প্রাণীর মতো না বুঝে করে গেছে এবং সেই মতো পুরস্কার দেবেন, কিম্বা দেবেন না। অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য না বুঝে বে-আক্কেলের মতো নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ইত্যাদি সব রকম সওয়াবের কাজ শুধু সওয়াব মনে করে করে গেলে কোন পুরস্কার দেওয়া হবে না।

এই হাদিসটাকে সহজ বাংলায় উপস্থাপন করলে এই রকম দাঁড়ায়- 'বিচারের দিনে পাক্কা নামাজীকে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন- নামাজ কায়েম করেছিলে? মানুষটি জবাব দেবে-হ্যাঁ আল্লাহ! আমি সারা জীবন নামাজ পড়েছি। আল্লাহ বলবেন-ভালো! কেন পড়েছিলে? লোকটি জবাব দেবে- তুমি প্রভু। তোমার আদেশ, এই তো যথেষ্ট, তুমি হুকুম করেছ তাই পড়েছি। আল্লাহ বলবেন- আমি হুকুম ঠিকই করেছি। কিন্তু কেন করেছি তা কি বুঝেছ? তোমার নামাজে আমার কি দরকার ছিল? আমি কি তোমার নামাজের মুখাপেক্ষী ছিলাম বা আছি? কী উদ্দেশ্যে তোমাকে নামাজ পড়তে হুকুম দিয়েছিলাম তা বুঝে কি নামাজ পড়েছিলে?" তখন যদি ঐ লোক জবাব দেয়- না। তাতো বুঝি নি, তবে মহানবীর (দ.) কথা মোতাবেক তার ভাগ্যে নামাজের কোন পুরস্কার জুটবে না। আর যে মানুষ আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে বলবে- হ্যাঁ আল্লাহ, আমি বুঝেই নামাজ পড়েছি। তোমার রসুলকে (দ.) তুমি দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলে পৃথিবী থেকে সব রকম অন্যায়, শোষণ, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাত দূর করে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে। তাঁর একার পক্ষে এবং এক জীবনে এ কাজ সম্ভব ছিল না। তাঁর প্রয়োজন ছিল একটা জাতির, একটা উম্মাহর, যে জাতির সাহায্যে এবং সহায়তায় তিনি তাঁর উপর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে, তোমার অসীম দয়ায়, আমি সেই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তোমার আদেশ নামাজের উদ্দেশ্য ছিল আমার সেই রকম চরিত্র সৃষ্টি করা, সেই রকম আনুগত্য, শৃঙ্খলা শিক্ষা করা, আত্মিক শক্তি, নৈতিক মনোবল, দৃঢ়তা, লক্ষ্যের প্রতি অবিচলতা চরিত্রে প্রতিষ্ঠা করা যা হলে আমি তোমার নবীর (দ.) দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর সাহায্যকারী হয়ে সংগ্রাম করতে পারি। তাই আমি বুঝেই নামাজ পড়েছি। এই লোক পাবে তার নামাজের পূর্ণ পুরস্কার।

আজকের মুসলিমরা যে দিন-রাত নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি হাজারো রকমের এবাদত-উপাসনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাদের এই আকিদাহীন, উদ্দেশ্যহীন, সামগ্রিক ধারণাহীন (comprehensive concept) আমলের কতটুকু দাম তারা আল্লাহর কাছে থেকে পাবেন তা এখন ভাববার সময় এসেছে।

একজন নারী একা পরিভ্রমণ করবে

এ দীনের লক্ষ্য সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা না পরকালে সওয়াব কামাই- এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই রসুলের জীবনের আরেকটি ঘটনার মধ্যে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, শান্তিময় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য সর্ব প্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা। তারপর ক্রমান্বয়ে আসে অর্থনৈতিক সুবিচার, তারপর ক্রমান্বয়ে আসে রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সুবিচার। এই প্রথমটি অর্থাৎ

নিরাপত্তা সম্পর্কে স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানে যতটা গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা বোঝার জন্য একটি ঘটনা গভীরভাবে বিবেচ্য। ঘটনাটি এই:-

একদিন মানবজীবনের জন্য স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান বহনকারী শেষ রসুল মোহাম্মদ (দ.) কা'বা শরীফের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তখন সময়টা ছিল এমন যখন তিনি ও তাঁর সহচরগণের ওপর প্রচণ্ড বাধা এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন চলছিল। হঠাৎ একজন সহচর (সাহাবা) বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এই অত্যাচার নিপীড়ন আর সহ্য হচ্ছে না। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমাদের বিরোধীরা সব যেন ধ্বংস হয়ে যায়। কথাটাকে আল্লাহর রসুল কতখানি গুরুত্ব দিলেন তা বোঝা যায় এই থেকে যে, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং ঐ সাহাবাকে বললেন, তুমি কী বললে? সাহাবা তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। শুনে আল্লাহর রসুল তাকে বললেন, **'শোন, শীঘ্রই সময় আসছে যখন কোন যুবতী মেয়ে গায়ে গহনা পরে একা সা'না থেকে হাদরামাউদ যাবে। তার মনে এক আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া আর কোন ভয় থাকবে না।'** (খাব্বাব রা. থেকে বোখারী ও মেশকাত)। এই ঘটনাটির মধ্যে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রোয়েছে। প্রথমত, আল্লাহর রসুল উদাহরণস্বরূপ বললেন, স্ত্রী লোক, কোন পুরুষের কথা বললেন না। কারণ স্ত্রী লোকের প্রাণ ও সম্পদ ছাড়াও আরও একটি জিনিস হারাবার সম্ভাবনা আছে যা পুরুষের নেই। সেটা হল ইযযত, সতীত্ব, মান-সম্ভ্রম। দ্বিতীয়ত, ঐ স্ত্রী লোক বয়সে যুবতী। অর্থাৎ আরও লোভনীয়। তৃতীয়ত, অলঙ্কার গহনা পরিহিত, চোর ডাকাতের জন্য লোভনীয়। এতগুলো লোভনীয় বিষয় থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর রসুল বলছেন, অনুরূপ একটি অলঙ্কার পরিহিত যুবতী স্ত্রীলোক একা সা'না শহর থেকে প্রায় তিনশ' মাইল দূরবর্তী হাদরামাউতে যেতে, যা অন্তত কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, এত দীর্ঘ পথে আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া কোন ভয় করবে না। চতুর্থত, লক্ষ্য করার বিষয়, স্ত্রীলোকটি শুধু পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হবে না, আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া অন্য কোন রকম বিপদের কোন আশঙ্কাই তার থাকবে না। চিন্তা করে দেখুন, একটি সমাজের নিরাপত্তা কোন্ পর্যায়ে গেলে অনুরূপ অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের মনে আল্লাহ এবং বন্য পশু ছাড়া আর কোন ভয়ই থাকে না।

এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই জীবনব্যবস্থার (দীন) প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বর্তমান দীনের উদ্দেশ্যের (আকীদা) বিরাট তফাৎও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রকৃত ইসলামের, জীবনব্যবস্থার উদ্দেশ্য মানবজীবনের নিরাপত্তা, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আর বর্তমানের ইসলামের উদ্দেশ্য ওসব কিছুই নয় বরং সময়মত নামাজ পড়া, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, লম্বা পোশাক ও খাটো পায়জামা পরা ইত্যাদি। বর্তমানের এই আকীদাই যদি সঠিক হত তবে আল্লাহর রসুল তাঁর সাহাবার কথার উত্তরে শীঘ্রই সেই অভূতপূর্ব নিরাপত্তা আসছে এ কথা না বলে বলতেন, অতি শীঘ্রই সময় আসছে যখন মানুষ দলে দলে মসজিদে নামাজ পড়তে যাবে, হজ্জ করবে, রোজা রাখবে, লম্বা লম্বা দাড়ি রাখবে, যেকের করবে, লম্বা জোব্বা আর খাঁটো পায়জামা পরবে।

রসুলাল্লাহ এই ভবিষ্যদ্বাণী করার কয়েক বছর পরই মুসলিম বিশ্বে এমন সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং মানুষগুলো এমন নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়েছিল যে, কেবল সা'না থেকে নয় ইরাকের হিরা থেকে নারীরা একা একা মক্কায় হজ পালন করতে আসতেন যা বিখ্যাত দানবীর হাতিম তা'ইয়ের সন্তান আদী (রা.) প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। (মুল্লা মজদুদ্দিন, সীরাতে মুস্তফা, দিল্লী: মাকতাবা, উসমানিয়া, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৫৭ এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন ও ড. এ এইচ মুজতবা হোছাইন) সুতরাং ইসলামের মূল লক্ষ্য শুধু পরকালীন সওয়াব কামাই নয়, পৃথিবীর মানুষের জীবনে ন্যায়, শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার ফলই হলো পরকালীন শান্তি। পৃথিবীতে যারা সবার পায়ের নিচের দাস হয়ে দলিত মথিত হচ্ছে তারা আখেরাতে শান্তিপূর্ণ জান্নাতের আশা কী করে করতে পারে?

স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে বর্তমানে মানবজাতি যে বিভিন্ন জীবনব্যবস্থা নিজেরা চিন্তাভাবনা করে তৈরি করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তা তাদের জীবনে কার্যকরী করছে তার ফল আমরা কী দেখছি? প্রথমেই ধরা যাক, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা। এর অবস্থা যতই দিন যাচ্ছে সর্বত্রই ক্রমান্বয়ে খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। ধনী উন্নত বিশ্ব তাদের যার যার দেশে খুন, জখম, রাহাজানী, অপহরণ, ধর্ষণ, প্রতারণা ইত্যাদি সমস্ত অপরাধ দমন, অন্ততপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিস, গোয়েন্দা বিভাগ, ফরেনসিক সাইন্স (Forensic Science) ইত্যাদির উন্নয়ন ও অপরাধ দমনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। এই সব উন্নত দেশে প্রতি ঘণ্টায় বিভিন্ন অপরাধের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সরকারগুলির আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ জগতের অপরাধীরাও সমান পাল্লা দিয়ে চলছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারও তাদের দারিদ্র্য ও অনুন্নত প্রযুক্তি নিয়ে অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই করতে পারছেন না। এ দেশগুলিতেও অপরাধের মাত্রা উন্নত দেশগুলির মতই ধাঁ-ধাঁ করে বেড়ে চলছে। অর্থাৎ মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে এই জীবনব্যবস্থাগুলো চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এ সত্য যে অস্বীকার করবে তার সত্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই।

ধর্মোন্মাদনার জন্মকথা:

রসুলাল্লাহ ছিলেন মুসলিমদের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি যখন রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করেছেন তখন তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়ের ধারকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। সামরিক পদক্ষেপ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিতে পারে না, এটা রাষ্ট্রের কাজ। ব্যক্তি বা সংগঠন পর্যায়ে সশস্ত্র পন্থা গ্রহণ সর্বযুগে সর্বকালে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে পরিগণিত হয়। রসুলাল্লাহর পরে যারা এ জাতির শাসক হয়েছেন তারা ধর্মীয় বিধি-বিধান কমবেশি মেনেই মুসলিম বিশ্বের নানা অংশে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তারা যখন মানুষকে শত্রুর মোকাবেলা করণার্থে আহ্বান জানাতেন তখন জনগণ ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক নেতার

আনুগত্য করত, সেই আহ্বানে সাড়া দিত। ধর্মব্যবসায়ী আলেম ওলামা শ্রেণির জন্ম হয়েছে রসুলাল্লাহর ইন্তেকালের কয়েক শ বছর পরে। তারাও রাষ্ট্রের শাসকদের পরামর্শক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণ থাকায় তাদের হাতে ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট, ধর্মনেতা হিসাবে জনগণের উপর যথেষ্ট প্রভাবও ছিল তাদের। কিন্তু ইতিহাসের একটি বাঁকে এসে মুসলিম জনগোষ্ঠী যখন ব্রিটিশসহ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির গোলামে পরিণত হলো তখনও এই আলেম ওলামারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মের কর্তৃপক্ষই থেকে গেছেন আর আগে যেমন মানুষ যেভাবে তাদের ডাকে সাড়া দিত, অন্য জাতির গোলাম হয়ে যাওয়ার পরও সেই প্রবণতা রয়ে গেল। জাতির মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হলো না যে, এই আলেমরা এখন আর তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নয়। সুতরাং তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো ন্যায্যতা আর ইসলামের নীতি মোতাবেক নেই, করলে সেটা সন্ত্রাস হবে। আগে জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। সেই মুরোদ বা সামর্থ্য না থাকায় তাদের মধ্যকার ফতোয়াবাজ কাঠমোল্লারা দুর্বল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তাদের এই ক্ষমতাকে কাজে লাগানো শুরু করল। আর আলেম শ্রেণি নিজেদের ক্ষমতাবান মনে করার যে সুখ সেই সুখ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তারা রাজত্ব হারালেও যাত্রাপালার রাজা সেজে নেতৃত্বের অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলেন। ভাবখানা হচ্ছে এমন যে, রাজদণ্ড নেই তো কী হয়েছে, ফতোয়া দিলে মানুষতো ঠিকই মানছে। সুতরাং ফতোয়াবাজি যতদিন পারা যায় করতে থাকি। তারা এই মহাসত্যটি জাতির সামনে সম্যকভাবে তুলে ধরলেন না। তারা আজ হিন্দুর বিরুদ্ধে, কাল কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে, পরশু অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাস্তিকতা বা কাফের-মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে গলা ফাটিয়ে ওয়াজ করে একটি উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেন। ফলে কোনো সংখ্যালঘু দুর্বল শ্রেণি ধর্মোন্মাদ তওহীদী জনতার রোষাণলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বিগত সময়ে কত মানুষকে তারা হত্যা করেছে, কত মানুষের বাড়িঘর তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এটাই হচ্ছে ফিতনা। আমাদের দেশে স্বাধীনতার ৪৬ বছরে না হলেও অর্ধশত ঘটনা ঘটেছে যেখানে মাইকে জনগণকে ডেকে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জনগণ মার মার কাট কাট করে ছুটে এসে জ্বালাও পোড়াও, হত্যাকাণ্ড, সম্প্রদায় বিশেষকে উচ্ছেদসহ নৃশংস কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এই ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ কাজটি বার বার করেছেন এবং এর যেন কোনো বিরতি নেই। তারা যেটা করছেন এটা আল্লাহর রসুল কখনও করেন নি, তাঁর সাহাবিরাও কখনও করেন নি। কিন্তু জনগণ তো আর সেটা জানে না, জনগণ আলেম সাহেব যা বলেন সেটাই ইসলাম মনে করে অন্ধবিশ্বাস নিয়ে পালন করে। বিশেষ করে ধর্মীয় নৃশংসতায় যখন কারো বাড়িঘরে হামলা করে লুটপাট করা, নিষ্ঠুরভাবে মানুষ মেরে বীরত্ব দেখানো, নারীদের ধর্ষণ করার মওকা পাওয়া যায় তখন তাতে অংশ নেওয়ার মত বর্বর স্বার্থান্বেষী মানুষের কোনো অভাব এ জাতির মধ্যে হয় নি। যখন এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে তখন তা চলে যায় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হাতে। তারা এটা নিয়ে নোংরা রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠে। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা তো বহু আগেই হারিয়ে গেছে। ধর্ম হয়ে

গেছে স্বার্থান্বেষী শ্রেণির হাতিয়ার আর ধর্মবিশ্বাসী জনগণ হয়ে গেছে তাদের অন্ধ আনুগত্যকারী মাত্র যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই ফেতনা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হবে?

আল্লাহর রসুল এ কথাটিও সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন যে তাঁর উম্মাহর মধ্যে কারা ফেতনা সৃষ্টি করবে। তিনি বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন- (১) ইসলাম শুধু নাম থাকবে, (২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, (৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না, (৪) আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, (৫) তাদের তৈরি ফেতনা তাদের ওপর পতিত হবে। [আলী (রা.) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]

ধর্ম থেকে ফায়দা হাসিলকারীদের হৃদয় কেমন হবে সেটাও রসুলাল্লাহ সুস্পষ্টভাষায় বলে গেছেন। তিনি বলেন, শেষ যামানায় কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা জনগণের সামনে ভেড়ার পশমের মত কোমল পোশাক পরবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র। আল্লাহ তা'আলা তাদের বলবেন: তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতেই এমন বিপর্যয় আপতিত করব, যা তাদের খুবই সহনশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে (আবু হোরায়রাহ রা. থেকে তিরমিজি)।

ফেতনা অর্থাৎ দাঙ্গা হাঙ্গামা এমন একটি ভয়ংকর বিষয় যা হাজার হাজার যুদ্ধের জন্ম দেয়। আমাদের মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে কোনো আলেমরা মানবসমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছে। এরা হচ্ছে সেই আলেম দাবিদার গোষ্ঠী যারা ধর্মকে তাদের ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করছে। ধর্ম এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আল্লাহ হলেন সত্যের চূড়ান্ত রূপ। মানুষ যখন তাঁর থেকে আগত সত্যকে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনে ধারণ করে তখন সমাজ শান্তিময় হয়, ন্যায়বিচারে পূর্ণ হয়। তিনি স্বয়ং ধর্মের মাধ্যমে মানব সমাজে মূর্ত হন, প্রকাশিত হন। যারা ধর্মের শিক্ষা দিয়ে, ধর্মের কাজ করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করে, ধর্মকে জীবিকার হাতিয়ারে পরিণত করে তারা সমাজে প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যভাষণের শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সে যখন একজন অসাধু ব্যক্তির থেকে সুবিধা গ্রহণ করে তখন তার মস্তক সেই টাকার কাছে বিকিয়ে যায়, সেই সাথে ধর্মও বিক্রি হয়ে যায়। সে ঐ অসাধু ব্যক্তির অপকর্মের প্রতিবাদ তো করতেই পারে না, উল্টো কীভাবে অসাধু ব্যক্তির স্বার্থরক্ষায় ধর্মের ফতোয়া ব্যবহার করা যায় সেই ফিকির করতে থাকে। এভাবে ধর্মের নামে অধর্ম সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। যে ধর্ম এসেছিল মানুষের কল্যাণের জন্য, সেই ধর্মের নামেই মানুষের অকল্যাণ করা হয়। যে ধর্ম এসেছিল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সেই ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়।

ইসলামকে পণ্য বানিয়ে আল্লাহ ও রসুলের যে অবমাননা এই জনগোষ্ঠীর আলেম নামধারী ধর্মব্যবসায়ীরা করেছেন শত শত বছর ধরে, সেটা আর কেউ করতে পারে

নি। তারা মানুষের ধর্মানুভূতিকে উত্তেজিত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষিপ্ত করে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে খুব পটু। বস্তুত তাদের এছাড়া আর কোনো ক্ষমতাও নেই। তাদের ওয়াজের কোনো ইতিবাচক প্রভাব সমাজে নেই। শীতকাল আসলে তারা ওয়াজ করবেন, মানুষ শুনবে, তাদের আহ্বানে উদ্বেলিত হয়ে কাড়ি কাড়ি টাকা ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবে পরকালীন মুক্তির আশায় এটা একটি রেওয়াজ হয়ে গেছে। **তাদের ওয়াজে কোনো সুদখোর মহাজন সুদ ছেড়ে দেয় না, কোনো মাদকব্যবসায়ী ব্যবসা ছেড়ে দেয় না, ব্যভিচারী ভালো হয়ে যায় না। অর্থাৎ ইসলাম যেভাবে বর্বর আরবদের চরিত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল এই ওয়াজশিল্পিরা সেটা করতে পারছেন না, তারা সমাজের অন্যায় অবিচার দূর করতে পুরোপুরি অক্ষম। এখন তারা এটুকুই পারেন, একটু গুজব তুলে দিয়ে সাময়িক একটি হুজুগ সৃষ্টি করে, ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ধর্মানুভূতিকে উসকে দিয়ে একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সে উত্তেজনারও মেয়াদ খুব সীমিত।** এই জাহেলিয়াতের, মূর্খামির অবসান তখনই হবে যখন ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষের সামনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, আদর্শ সুস্পষ্ট হবে। তারা জানতে পারবে যে দাঙ্গা ও জেহাদ, যুদ্ধ কখনও এক নয়। যুদ্ধের নীতি থাকে দাঙ্গায় কোনো নীতি থাকে না। আল্লাহর রসুল যতগুলো যুদ্ধ করেছেন সবগুলোতে তাঁর সৈন্যবাহিনী থেকে প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনী ছিল কয়েকগুণ বড়। দাঙ্গায় হয় এর উল্টো। দুর্বল একটি গোষ্ঠীর উপর সংখ্যাধিক্যের শক্তিতে সংগঠিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়। মানুষের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়, হত্যাকাণ্ড হলে সেটাকে গণপিটুনি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, উসকানিদাতা ধর্মব্যবসায়ীরা লেবাসের আড়াল নিয়ে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ সত্ত্বেও আইনের হাত থেকে পার পেয়ে যান। রাজনৈতিক নেতারাও এই ভণ্ড ধর্মনেতাদের সমীহ করে চলেন কেবলমাত্র ভোটের জন্য। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মের নামে এই অন্যায় আমাদের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তথাপি চিন্তাহীনতা, যুক্তিহীনতা, কূপমণ্ডূকতা আজ মুসলিম জাতির ধর্মবোধ, ধর্মচিন্তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে তারা তাদের পালিত ধর্ম আদতে তাদের কতটুকু কাজে আসছে, আখেরাতে তা তাদেরকে জান্নাতে নিতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে চিন্তা করার, নিজের কাছে সেই প্রশ্ন উত্থাপনের সাহসিকতা ও মানসিকতাও হারিয়ে ফেলেছে।

তাদের এই চিন্তার জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিতে প্রয়োজন হচ্ছে আরেকটি রেনেসাঁর (Renaissance)। তারা তো ১৩০০ বছর আগে পথ হারিয়েছে, গন্তব্য ভুলে গেছে। শরিয়ত, মারেফত, ফেরকা, মাজহাবের গভীর অরণ্যে হারিয়ে গিয়েছে। এখন বহু ধরনের মত-পথ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ হয়েছে স্বার্থোদ্ধারকারী পীর, কেউ হয়েছে ভয়ানক জঙ্গি, কেউ হয়েছে রাজনৈতিক ইসলামপন্থী, কেউ আবার ব্যক্তিগত আমলের জোরে জান্নাতে যেতে চাচ্ছেন। এমতাবস্থায় মানুষ কোন ব্যবস্থার চর্চা করে দুনিয়াতেও শান্তি পাবে আখেরাতও জান্নাত পাবে, সে সঠিক পথ কোনটি? সেই পথের সন্ধান করা এখন মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীঃ বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.)

প্রাক ইসলামী আরবরা ছিল ভিখিরির জাত। ন্যূনতম সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নৈতিকতাবোধ, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, মানবিক উৎকর্ষতা, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্যচেতনা ইত্যাদি কিছুই তাদের ছিল না। শুধু ছিল বংশানুক্রমিক গৃহযুদ্ধ, গোত্রে গোত্রে হানাহানি, রক্তারক্তি, শত্রুতা, সীমাহীন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ধর্মবাণিজ্য, জেনা-ব্যাভিচার, চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, হুজুগপ্রবণতা, মাদকাসক্তি, দাসপ্রথা, কন্যাশিশু হত্যা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি। অর্থাৎ ভালোর মধ্যে কিছু না থাকলেও খারাপের মধ্যে কিছুই বাদ ছিল না তাদের। সেই চরম অনৈতিকতা ও বর্বরতায় লিপ্ত লোকগুলোকেই মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে বিশ্বনবী কোথায় নিয়ে দাঁড়া করালেন এবং তাঁর দেখানো পথনির্দেশ মোতাবেক তাঁর ওফাতের পর মাত্র কয়েক দশক না পেরোতেই ঐ আরবরাই তরতর করে উন্নতির কোন শিখরে গিয়ে পৌঁছল সে ইতিহাস আমরা সবাই জানি। ভুখা-নাঙ্গা আরবদের এই যে অকল্পনীয় মহা বিস্ফোরণের জ্বালানি যুগিয়েছেন মাত্র একজন মানুষ, তিনি বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.)। আর তা করতে গিয়ে ঐ মহাবিপ্লবী মানুষটিকে একটি চরম পশ্চাদপদ জাতির প্রতিটি দিকে, প্রতিটি অঙ্গনে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার সাথে 'অসম্ভব গতিশীল' পদচারণা করতে হয়েছে। একটি শিশুর জন্মপ্রক্রিয়া থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত- মানবজীবনের হেন দিক নেই যা নিয়ে তাঁকে ভাবতে হয় নি, কথা বলতে হয় নি।

তাঁকে ভাবতে হয়েছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে, পররাষ্ট্রনীতি ও স্বরাষ্ট্রনীতি নিয়ে, অর্থনীতি নিয়ে, সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে, পারিবারিক বন্ধন নিয়ে, এমনকি ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা নিয়েও। তাঁকে ইহকালের পাশাপাশি সমাধান দিতে হয়েছে পরকালের, দেহের পাশাপাশি আত্মার। হাজারো সমস্যা তাঁর সামনে হাজির করা হত। যার যত প্রশ্ন ছিল তাঁর সামনে অবলীলায় বলে ফেলতে পারত। যার যত দাবি-দাওয়া, প্রত্যাশা থাকত অকাতরে উত্থাপন করত। একেক মানুষের চিন্তাধারা, বিশ্বাস, কর্মজীবন ছিল একেকরকম। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের রীতি-নীতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ওদিকে শত্রুশিবির গমগম করত ধারাবাহিক যুদ্ধের আয়োজনে। কখনও কখনও জাতির অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়ে যেত, যেমন খন্দকের যুদ্ধ বা অবরোধ! তথাপি শত প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তিলে তিলে তিনি একটি জাতি গঠন করলেন। প্রথমত ভিন্নমতের, ভিন্ন বিশ্বাসের, ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন খাদ্যাভ্যাসের ও ভিন্ন জীবিকার মানুষগুলোকে আহ্বান জানালেন যাবতীয় অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে, তারপর যারা ঐক্যবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত নিল তাদের নিয়ে একটু একটু করে গড়ে তুললেন জাতির রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসাব্যবস্থা, বাজারব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। তাঁকে অনৈক্যপ্রবণ মানুষগুলোর মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগাতে হয়েছে। বিশৃঙ্খল মানুষকে শৃঙ্খলাবোধ শেখাতে হয়েছে। ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যপ্রবণদের আনুগত্যপরায়ণ করতে হয়েছে। জ্ঞানচর্চাবিমুখ একটি জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানমুখী করতে হয়েছে। যে

অস্ত্র ব্যবহৃত হত কেবলই প্রতিশোধমূলক শত্রুতার কাজে, সে অস্ত্রের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়েছে মানুষের কল্যাণের পথে।

এ গেল একটি দিক, বাহ্যিক দিক। অন্য দিকটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। জাতির বাহ্যিক পরিবর্তনের চেয়েও আত্মিক পরিবর্তন বেশি জরুরি এটা আল্লাহর রসুল ভালোভাবেই জানতেন। তিনি জানতেন যাদের নিয়ে তাঁর পথ চলা তারা খুব বেশিদিন হয় নি জাহেলিয়াতের যুগ অতিক্রম করেছে। সেই জাহেলিয়াত যাতে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তারও নিশ্চয়তা বিধান করতে হয়েছে তাঁকে। ভোগ্য দ্রব্য-সামগ্রির বস্তু হিসেবে বিবেচিত হত নারীরা। সেই নারীদের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে তাঁকে। কেবল ব্যাভিচার নিষিদ্ধকরণই তাঁর শেষ কথা ছিল না, কোন প্রক্রিয়ায় সামাজিক-পারিবারিক জীবন দূষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ হবে সে উপায়ও তুলে ধরতে হয়েছে তাকে। যে সমাজে দাসীদেরকে মনে করা হত নিছক যৌন সামগ্রী, মনরঞ্জনের বস্তু, সেই সমাজকেই বিশ্বাস করাতে হয়েছে দাসীরাও তোমাদের মতই রক্ত-মাংসের মানুষ, তাদেরও হৃদয় আছে, তাদেরও দুঃখ-কষ্টবোধ আছে। তারা যন্ত্র নয়। তোমরা যে আল্লাহর সৃষ্টি, তারাও সেই আল্লাহর সৃষ্টি। সব মানুষ এক পিতা-মাতা আদম হাওয়ার সন্তান, আল্লাহর চোখে সবাই সমান। এই বিশ্বাস পোক্ত করার জন্য তিনি নিজেই একজন দাসীকে, মারিয়া কিবতিয়াকে (রা.) বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন।

আল্লাহর রসুল জানতেন কেবল দাসমুক্তির ব্যবস্থা করাই একমাত্র সমাধান নয়। ঐ মুক্তদাসেরা যতদিন সমাজের আর দশজন মানুষের মতই সমমর্যাদা ভোগ না করছে ততদিন লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ফলে দাসদের সমমর্যাদা নিশ্চিত করার মনস্তাত্ত্বিক লড়াইতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহামানব এমন কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা বিশ্বের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে চিরদিন। মক্কা বিজয়ের দিনে অর্ধনগ্ন হাবশী বেলালকে (রা.) ক্বাবার ছাদে উঠিয়ে বিশ্বনবী কোরাইশ আভিজাত্য ও অহংকারের মূলে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে বুঝিয়ে দিলেন- ''এই হচ্ছে ইসলাম। এই হচ্ছে ইসলামের মূল্যবোধ। তোমরা যাদেরকে মানুষই মনে করতে না তারা আমার আল্লাহর কাছে এই ক্বাবার চাইতেও বেশি প্রিয়।'' একইভাবে জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়ে বাঘা বাঘা কোরাইশ ও আনসারদেরকে রেখে ওসামা বিন যায়েদকে (যার পিতা এক সময় দাস ছিলেন) যুদ্ধের সেনাপতি বানানোর ঘটনাই কি কম তাৎপযপূর্ণ? এর মাধ্যমে রসুল উম্মতের জন্য আরও এক প্রস্থ শিক্ষা রেখে যান যে, ইসলামে নেতৃত্বের যোগ্যতা বংশীয় আভিজাত্য দিয়ে নয়, দক্ষতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এগুলো নিছক একেকটি ঘটনা নয়, একেকটি মাইলফলক।

এটা ইতিহাস যে, অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী কার্ল মার্কস সারাটা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানবজীবনের কেবল অর্থনৈতিক মুক্তির একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। সে তত্ত্বও ভারসাম্যপূর্ণ নয়, সম্পূর্ণ আত্মাবিবর্জিত সুতরাং অপ্রাকৃতিক। অথচ বিশ্বনবী কেবল অর্থনীতি নয়, কেবল জাতীয় নীতি নয়, কেবল আইন-কানুন-দণ্ডবিধি নয়, কেবল প্রশাসন পরিচালনা নয়, কেবল নারী অধিকার নিশ্চিতকরণ নয়,

কেবল শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণ নয়, কেবল মানুষের জৈব চাহিদা পূরণ নয়, কেবল আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ নয়, কেবল ইহকালীন মুক্তি নয়, বরং মানবজাতির 'সামষ্টিক' জীবনের 'পূর্ণাঙ্গ' ও 'ভারসাম্যপূর্ণ' দিক-নির্দেশনা দান করেছেন এবং মাত্র ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজ হাতে সেটার বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে গেছেন। জাহেলিয়াতের সমুদ্র থেকে আস্ত একটি জাতিকে একাই তীরে টেনে তুলেছেন। এ যেন কল্পনার পরিধিকেও ছাড়িয়ে যায়!

ইদানীং একটি শ্রেণি গজিয়েছে তারা অভিমানে গাল ফোলান আল্লাহর রসুল দাসপ্রথাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন না কেন, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করলেন না কেন, যুদ্ধ-রক্তপাত নিষিদ্ধ করলেন না কেন ইত্যাদি নিয়ে। আল্লাহর রসুল কী কী করেন নি- এ নিয়ে গবেষণা করে মাথা খারাপ করার দরকার পড়ত না যদি তারা বুঝতে সক্ষম হতেন তিনি কী কী করেছিলেন, কোন অসাধ্যগুলো তাঁকে সাধন করতে হয়েছিল মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে। নারী অধিকারের প্রসঙ্গে বলতে হয়- ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব হয়ে যাবার পরও নিছক ভোটদানের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করে নারীদেরকে গিলোটিনে প্রাণ হারাতে হয়েছে। তখন পর্যন্ত ইউরোপের অবস্থাই যদি এমন শোচনীয় হয় তবে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে কী ঘটছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর নারীরাই যদি এমন ব্রাত্যদশা ভোগ করে তবে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের একটি বর্বরতম জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরা কত বঞ্চিত ও অবহেলিত দিনাতিপাত করত তাও অনুমেয়। সেই অবস্থা থেকে বিশ্বনবী নারীদেরকে কোন অবস্থানে উন্নীত করেছিলেন তা ইতিহাস। জাতীয় ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ তো নিশ্চিত হয়েছিলই, এমনকি বিশ্বনবী নারীদেরকে নিয়ে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন। নারী-পুরুষ একসাথে মসজিদে নববীতে সালাহ কায়েম করত। একসাথে হজ্ব করত। একসাথে বসে রসুলের আলোচনা, বক্তৃতা শুনত, কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন করে জেনে নিত। একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও রসুলের সাথে নারীদের পরামর্শ করার ঘটনা জানা যায়। মসজিদে নববীর পাশে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল যার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একজন নারী, রুফায়দাহ (রা.)। হযরত উমার (রা.) এর খেলাফতের সময় বাজার দেখাশোনা করার দায়িত্ব পালন করেছেন একজন নারী, শেফা (রা.)। ওহুদ যুদ্ধে উম্মে আম্মারা (রা.) মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন আল্লাহর রসুল স্বয়ং।

এ ইতিহাসগুলো কীভাবে নারীবাদীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় আমার বুঝে আসে না। এতবড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন করলেন যে মানুষটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক একটি শব্দ উচ্চারণ না করলেও কেন তিনি তেরোটি বিয়ে করলেন- এ নিয়ে হাজার হাজার লাইন লেখা হচ্ছে অবিরত। অথচ রসুল (সা.) না এলে তেরোটি বিয়ে কেন, নিছক একজন গোত্রপতি তেরশত যৌনদাসী রাখলেও কারও কিছু বলার ছিল না। ভুলে যাচ্ছেন কেন, ঐ যুগে দাস-দাসীর পরিমাণ দিয়ে সামাজিক মর্যাদা নির্ণিত হত।

একইভাবে রসুল (সা.) দাসপ্রথাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নি বলে

যারা চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন তারাও অতি প্রায়ান্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে পারলে তিনি দাসপ্রথার মূলে যে শক্ত কুঠারাঘাত করেছেন এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ককে ঢেলে সাজিয়ে আধুনিক মূল্যবোধের ছাঁচে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন তা স্পষ্ট দেখতে পেতেন। যে মূল্যবোধ তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা আজকের যুগেও কেউ কল্পনা করতে পারে? মাত্র তিনটি শর্ত-

ক. কাউকে শ্রম দিতে বাধ্য করা যাবে না,

খ. শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি তার ঘাম শুকোনোর আগেই পরিশোধ করতে হবে,

গ. নিজে যা খাবে, পরবে, শ্রমিককেও তা খেতে ও পরতে দিতে হবে।

এই মূল্যবোধের কানাকড়িও কি আজকের কথিত আধুনিক সভ্যতায় বাস্তবায়িত হয়? হয় না। আল্লাহর রসুল দাসপ্রথাকে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন মালিক-শ্রমিক ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে, সেই সাথে 'আল্লাহর চোখে সবাই সমান'- এই মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে। অন্যদিকে যারা ইসলামের ভেতর দাসপ্রথার গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছেন তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে ভালোবাসার, ভ্রাতৃত্বের, ত্যাগের কোনো স্থান নেই। এখানে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক শত্রুতার, বিদ্বেষের ও তীক্ততার। আদী দাসপ্রথার গায়ে রঙচঙ মেখে স্বাধীনতার মোড়ক পরিয়ে রাখা হলেও এই ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে যারা একটি বর্ণও লেখার প্রয়োজনবোধ করেন না তারাই যখন ইসলামে দাসপ্রথা আবিষ্কারের অভিলাসে ইতিহাস ছাঁকতে বসেন তখন বিষয়টি হাস্যকর দেখায়। দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যেত? আমেরিকায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ও সাদা-কালোর ব্যবধান আইন করে অস্বীকার করা হয়েছে কয়েক শতাব্দী আগে। তাতে শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই হয়ে যায় নি, সাদা-কালোর ব্যবধানও দূর করা সম্ভব হয় নি আজও। আজও সাদারা কালোদের হত্যা করলে বিচারের দাবিতে আন্দোলনে নামতে হয়। মনে রাখতে হবে- আইন করে মানসিক পরিবর্তন ঘটানো যায় না। অথচ বিশ্বনবীর দায়িত্ব ছিল মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক পরিবর্তন ঘটানো।

আল্লাহর রসুলের সংগ্রামী জীবনকে যারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন তারা জানেন দাসপ্রথার মূলে ইসলাম কতটা শক্ত আঘাত হেনেছিল। সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি যে বিস্ময়কর জাতিটি গঠন করেছিলেন, তাঁর ওফাতের পর অর্ধদুনিয়ায় যে জাতি ন্যায়, সুবিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই জাতিটি যদি হঠাৎ লক্ষ্য ভুলে না যেত, তাহলে ঐ সময়ই পৃথিবী থেকে দাসপ্রথাসহ যাবতীয় কুপ্রথার কবর রচিত হয়ে যেত তাতে সন্দেহ নেই। আজকে যারা নারীমুক্তির আন্দোলন করছেন তাদেরও স্বপ্নপূরণ হয়ে যেত তখনই। দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয় নি। হয় নি যে, তার জন্য কি বিশ্বনবী দায়ী? কতটা অন্ধ হলে, কতটা বিবেকবোধ লুপ্ত হলে, কতটা সংকীর্ণমনা হলে মানবতার কল্যাণে একজন মানুষের সারা জীবনের অকৃত্রিম সাধনা ও অতুলনীয় আত্মত্যাগকে ভুলে গিয়ে, তাঁর নেতৃত্বাধীন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবকে পাশ কাটিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত বিয়ে-সাদী ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনায় মুখর হওয়া যায়? সত্যিই এ অন্ধত্বের কোনো তুলনা হয় না! কোনো উপমা হয় না!

ইসলামবিদ্বেষীদের অন্ধত্বের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, তারা বলেন ইসলামের প্রথম চার খলিফার তিনজনই আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং ইসলাম মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছিল এমন দাবি নিতান্তই অসার। দেখা যাক তাদের তাদের এ ব্যাখ্যা কতটুকু যৌক্তিক।

উমর (রা.) তখন অর্ধ পৃথিবীর শাসক। রোমান ও পারস্যের হাজার বছরের সাম্রাজ্যগুলোও তার শাসনাধীন। বহু রণাঙ্গনে তখনও যুদ্ধ চলছে। শত্রুর কোনো ইয়ত্তা নেই। তবু আশ্চর্য! সেই শাসকের একজন দেহরক্ষীও ছিল না। একদিন দুপুর বেলা বিদেশী দূত এসেছেন। তিনি লোকজনকে জিজ্ঞেস করছেন যে, খলিফা কোথায়? তখন একজন লোক দেখিয়ে দিল, ঐ যে খেজুর গাছের নিচে যিনি ঘুমিয়ে আছেন, তিনিই উমর বিন খাত্তাব (রা.)।

আরেকটি ঘটনা। জেরুজালেমের দূর্গের সামনে অপেক্ষা করে আছেন রাজন্যবর্গ। মুসলিম জাতির খলিফা আসছেন হাজার মাইল মরুপথ পাড়ি দিয়ে। দুজন লোককে দেখা গেল, একজন উটের পিঠে, আরেকজন উটের রশি ধরে হেঁটে আসছেন। হ্যাঁ, নিজ ভৃত্তকে উটে বসিয়ে যিনি তপ্ত বালুরাশি মাড়িয়ে হেঁটে আসছেন তিনিই সেই অর্ধ দুনিয়ার শাসক। কোনো দেহরক্ষী নেই, কোনো প্রটোকল নেই।

আজকের আধুনিক পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কগণ যখন পথ চলেন তখন তাদের আড়ম্বর, নিরাপত্তা বাহিনী আর দেহরক্ষীদের হুলুস্থুল জনগণকে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়। দেহরক্ষী ছাড়া তারা এক ঘণ্টাও বেঁচে থাকতে পারবেন কিনা সন্দেহ? রাষ্ট্রনায়ক দূরে থাক, একজন সামান্য জনপ্রতিনিধিও দেহরক্ষী বিনা থাকতে সাহস পান না।

প্রশ্ন তোলা হয় শুধু ইসলামের খলিফাদেরকে নিয়ে যে, এ কেমন শান্তিপূর্ণ সমাজ যার প্রথম চারজন শাসকের তিনজনকেই ঘাতকের হাতে নিহত হতে হয়েছে? যারা এই প্রশ্ন করেন তারা কি ওমরের (রা.) নয় বছর, ওসমানের (রা.) ১১ বছর বিনা দেহরক্ষীতে অর্ধ দুনিয়া শাসন করার মতো অপর কোনো উদাহরণ দেখাতে পারবেন? বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বাঙালি জাতির প্রতি যাঁর আস্থা ও ভালোবাসা ছিল প্রশ্নাতীত, সেই লোকটিকে তার রক্ষীবাহিনী কতদিন রক্ষা করতে পেরেছিল? ধর্মীয় আবেগ বা ধর্মবিদ্বেষ কথাটি আপাতত শিকেয় তুলে বাস্তবতার নিরিখে এখন সবার কথা বলা উচিত।

মুসলিমদের কেন অভিশপ্ত জনগোষ্ঠীর পরিণতি হলো?

এ আগুন অভিশাপের আগুন

মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করার দরুন আল্লাহর অভিশাপ (লানত) ও ক্রোধের (গজব) শিকার হয়েছে, এই সত্যটি এখনও সময় থাকতে তাদের উপলব্ধি করতে হবে। কারণ তাদের জাতিসত্তা বহু আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন তারা নাম পরিচয়ের বদৌলতে শারীরিকভাবে নির্মূল হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। শতবছর আগে কবি নজরুল লিখেছিলেন, "গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মতো"। এখন আমরা বেড়ে বেড়ে ১৬০ কোটি হয়েছি বলে আমাদেরকে একবারে নির্মূল করে ফেলতে কিছুটা সময় লাগছে। তবে বিশৃঙ্খল, শতধাবিভক্ত জনসংখ্যাটিকে পুরোপুরি নির্মূল করার প্রক্রিয়া চলছে জোরেশোরে এবং তাতে কোনো রাখঢাকও নেই। মনে রাখতে হবে এটি তাদের পূর্বঘোষিত সভ্যতার সংঘাত বা The Clash of Civilizations। এতে এখন চলছে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সার্বভৌমত্বের লড়াই। রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবি করে এবং শাসনকার্য পরিচালনার মতো যথেষ্ট উপাদান আর কোনো ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কাছে নেই। তাই রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা বা লড়াইতে পশ্চিমা সভ্যতার এমন আর কোনো ধর্মমত পৃথিবীতে নেই। বহু শতাব্দী থেকেই মুসলিমরা পশ্চিমাদের পদানত গোলাম হয়ে আছে, তাদের সামগ্রিক জীবনের প্রভু বলে পশ্চিমা সভ্যতাকে মান্য করে চলেছে। কিন্তু এটুকু যথেষ্ট নয়, পশ্চিমা সভ্যতার প্রভুত্বকে অস্বীকার করার একটি প্রবণতা যেখানেই দেখা গেছে সেখানেই সামরিক অভিযান করে প্রভুত্বকে নিরঙ্কুশ করেছে পাশ্চাত্যের পরাশক্তিধর রাষ্ট্র বা তাদের জোট। তাদের হাতে রয়েছে বিপুল মারণাস্ত্র। ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ করা হলে কেবল মুসলিমই মরবে না, পৃথিবীটাও ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন কি নিজেদের অস্তিত্বও সংকটে পড়বে। এ কারণে একটা একটা করে দেশ ধরা হচ্ছে। পূর্বেই স্বাধীনতা প্রদানের নাম করে মুসলিম জাতিকে ৫৫টি ভৌগোলিক রাষ্ট্রে বিভক্ত করা গেছে। **পুরোটা আম একবারে মুখে ঢোকে না, তাই টুকরো টুকরো করে আরামসে খাওয়া যায়। খাবে কিন্তু পুরোটাই, অর্থাৎ ১৬০ কোটিই তাদের টার্গেট।**

এই নতুন শতাব্দীতে ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, ফিলিস্তিন ইত্যাদি দেশে আক্রমণ করে অন্তত ২০ লক্ষ মুসলমান দাবিদারকে হত্যা করা হয়েছে। কোটি কোটি মুসলমান দাবিদার সর্বহারা উদ্বাস্তু। এটা তাদের ঈমানের পরীক্ষা নয়, এটা অভিশাপ - এত মার খেয়েও এই হুঁশ তাদের আসছে না। পশ্চিমা সভ্যতা অনেক ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর কথা বলে। মানুষকে সভ্য আচার শেখায়, গণতন্ত্র শেখায় কিন্তু তাদের রাজনৈতিক নীতি, আগ্রাসনের নীতি গোটা পৃথিবীকে শোষণ, শাসন, ত্রাসন করে চলেছে, এ সত্যটি আর যেই উপেক্ষা করুক মুসলিমরা করতে

পারে না। কারণ যে মার খায় সে অবশ্যই তা অনুভব করে আর পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিটি আঘাত তাদের পিঠেই পড়ছে, প্রতিটি অস্ত্র তাদের প্রাণই হরণ করছে। এই আঘাত থেকে যারা বিশ্বাসে মুসলিম নয় কিন্তু বংশে মুসলিম তারাও বাঁচবে না। তাদেরকে পারলে মঙ্গলগ্রহে পাঠিয়ে দিবে, ভিসা বাতিল করবে, তাদের দেশে ঢুকতে দেবে না, নয়তো মর্যাদাবান ক্রীতদাস (Dignified Slave) বানিয়ে রাখবে।

মুসলিমদের আজকের এই পরিণতির জন্য কেবল সাম্রাজ্যবাদীদের উপর দায় চাপানো, তাদেরকে বিষোদগার করে যাওয়ার কোনো মানে নেই। তারা ইসলামকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করেছে এটা ঠিক কিন্তু মুসলিমদের এই দুর্দশার মূল কারণ এটা আল্লাহর শাস্তি, আল্লাহর অভিশাপ, আল্লাহর গজবের ফল। আল্লাহর গজব অমোঘ, সুতরাং মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরাট ধ্বংস এখন অনিবার্য পরিণতি। পশ্চিমা সভ্যতা মুসলিম জাতির উপর আপতিত হয়েছে গজবের পার্থিব রূপ নিয়ে, ঠিক যেভাবে বাগদাদের উপর নাজিল হয়েছিল হালাকু খান, দিল্লিতে তৈমুর লঙ, আলেপ্পোতে চেঙ্গিস খান, মোঘলদের উপর নাজিল হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ঠিক সেভাবেই মুসলিমদেরকে চূড়ান্ত মার দেওয়ার জন্য, একেবারে সমূলে বিনাশ করার এখন প্রস্তুতি চলছে। এভাবেই আল্লাহ এক জাতিকে দিয়ে আরেক জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন।

কিন্তু এই গজব থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম জাতির কোনো উদ্যোগ নেই, আগ্রহই নেই, মনোযোগও নেই। তাদের বৃহত্তর ভাগ বিশ্বাস করেন যে জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার বদৌলতে লক্ষ কোটি বছর যদি জাহান্নামের আগুনে জ্বলতেও হয়, তবু এক সময় তারা জান্নাতে যাবেনই। সুতরাং চিন্তিত হওয়ার মতো তেমন কিছু ঘটে নি। এই দুনিয়ার মার খাচ্ছি, ঐ দুনিয়ায় জান্নাতের ফল খেয়ে সব ব্যথা বেদনা, লাঞ্ছনা অপমান ভুলে যাব। তারা জান্নাতে তাদের স্তর উন্নীত করার জন্য সাধ্যমত আমলও করেন যেমন নামাজ, রোজা করেন, ওয়াজের সময় ওয়াজ শোনেন, হজ্বে এস্তেমায় যান, দাড়ি রেখে নিজেকে উম্মতে মোহাম্মদ বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তাদের এই সত্য বোঝার মত চিন্তাশক্তি নেই যে, যে ধর্মচর্চা তাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা অপমান থেকে রক্ষা করতে পারছে না, সেই ধর্ম পালন করে পরকালীন মুক্তির আশা পোষণ করা সুদূর পরাহত। **আর জাতির মধ্যে দু প্রকার শিক্ষিত শ্রেণি। একদল নিজেদেরকে আলেম মনে করেন। তারা ধর্মকে তাদের পেশায়, ব্যবসায় পরিণত করেছেন। বিকৃত ইসলামটাকে বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করেন। আর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠটির বড় একটি অংশ ধর্মের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন এমন কি ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে পড়েছেন। তারা নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন।** তারা উটপাখির মত সমাজের অন্যায় অবিচার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে আত্মপূজায় ডুবে আছে। তারা পশ্চিমা সভ্যতাকে তাদের প্রভু হিসাবে, পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে তাদের দাসে পরিণত করেছে, মুসলিম বিশ্বের সম্পদ শোষণ করে নেওয়ার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু তারা উপরে উপরে বলছে যে

তারা সব ধর্মের মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখে, তারা অসাম্প্রদায়িক। তাদের এই মানবতাবাদী বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া শ্রেণিটি। তারা মুসলিম পরিচয়ধারীদেরকে তাদের দেশে ঢুকতে দিতে নারাজ, কারণ তারা মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী বলে পরিচিত করে তুলেছে। কিন্তু এই মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণিটি নাস্তিক সেজে, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ সেজে চেষ্টা করছে কোনোভাবে নিজেদের গায়ের থেকে মুসলিমের গন্ধটা ঝেড়ে ফেলতে। **মুরগিটা যেন প্রাণপণে শিয়ালকে বলছে, আমি মনে প্রাণে অ-মুরগি। বিশ্বাস করো, আমার নামটা মুসলিমের মত লাগলেও আমি আসলে মুসলিম না। আমার বাপ-দাদা মুসলিম ছিল, কিন্তু আমি চিন্তা চেতনায় বাঙালি, শুধুই বাঙালি।** আমি আল্লাহ খোদায় বিশ্বাস করি না। আমি ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। কিন্তু এতে কোনো লাভ হচ্ছে না। শিয়াল মুরগিকে নিরাপত্তা দিলেও সেই নিরাপত্তা কতটুকু স্বস্তিদায়ক সেটা মুরগিও প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে কিন্তু মুসলিম জাতি সেটাও অনুভব করছে না। এতই গভীর হীনম্মন্যতা ও অন্ধত্বে তারা নিমজ্জিত হয়ে আছে।

পরীক্ষা নয়, শাস্তি

এই মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীর উপর যে শাস্তি চলছে তার কারণ পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষাতেই উল্লেখ করেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ উপযুক্ত কারণ ছাড়া, পূর্বাভাস, সতর্কবার্তা প্রেরণ ছাড়া কোনো জাতির উপর গজব বা শাস্তি আরোপ করেন না। এমন কি আল্লাহর গজব প্রাকৃতিক নিয়মের শৃঙ্খলা মোতাবেকই হয়। **সব কাজের একটি পরিণতি থাকবে এটা খুব প্রাকৃতিক কথা। মানুষের জীবন কর্মফলের চক্রে বাঁধা, সেটা ব্যক্তিজীবন হোক বা সামষ্টিক জীবন হোক।** আল্লাহ বলেন, হে মানুষ! তোমাদের কর্মের প্রতিক্রিয়াতেই জলেস্থলে বিপর্যয় ও বিপদ ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তখন তোমাদের কৃতকর্মের ফল কিছুটা আস্বাদনের সুযোগ দেন, যাতে করে তোমরা শিক্ষা পেয়ে সত্যপথে ফিরে আসতে পারো (সুরা রুম ৪১)। অর্থাৎ সামান্য শাস্তি ভোগ করে যদি মানুষ সত্যপথে ফিরে আসে তবে সার্বিক ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে।

অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাঃ

যখন কোনো জাতি ন্যায়-অন্যায়ের প্রতিটি সীমারেখা ভেঙে ফেলে তখন তাদের সম্মিলিত অন্যায়ের (জুলুম বা সীমালঙ্ঘন) পরিণাম গোটা জাতি ভোগ করে। যখন সেই পরিণাম ভোগের সময় আসে তখন ঐ জাতির মধ্যে থাকা উত্তম মানুষগুলোও ব্যক্তিগতভাবে তা থেকে বাঁচতে পারে না। এমন কি সেই জাতি তাদের মা-বোনদের সম্মানও রক্ষা করতে পারে না। বর্তমানে সিরিয়ার রিফিউজি মুসলিম মেয়েদেরকে ক্ষুধার জ্বালায় পতিতাবৃত্তিও করতে হচ্ছে। এটা ঈমানের পরীক্ষা নয়, এটা গজব। পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ মো'মেনদের সম্মান বৃদ্ধি করেন, মর্যাদা উন্নত করেন। আমাদের নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কারো শরীরে যদি কাঁটা বিঁধে যায় আর এর ফলে কষ্ট হয় তাহলে আল্লাহ এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং

তার গুনাহ মাফ করে দেন (মুসলিম)। কিন্তু গজব অন্য বিষয়। এর দ্বারা অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে আল্লাহ চূড়ান্ত দণ্ড প্রদান করেন। এটা শাসন বা পরীক্ষা নয়, শাস্তি। মো'মেনদেরকে আল্লাহ শাস্তি দেন না, আজাব দেন না, গজব দেন না। মো'মেনদের প্রতি তিনি সদয়, করুণাময়, ক্ষমাশীল। আর কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী), জালেম (সীমালঙ্ঘনকারী), ফাসেকদের (অবাধ্য) প্রতি তিনি অত্যন্ত নির্মম। এজন্যই তাঁর একটি নাম কাহ্হার (কঠোর)।

এই মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীর জাগতিক হীনতা, অপমান লাঞ্ছনার একমাত্র কারণ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেন নয়। তারা আল্লামা হতে পারেন, মুফতি হতে পারেন, মহাশিক্ষিত, মহা বুজুর্গানে দীন হতে পারেন কিন্তু তারা মো'মেন না। তারা বহু আগেই তাদের দীন হিসাবে ইসলামকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের নানাবিধ জীবনব্যবস্থা ও দর্শনকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং রসুলাল্লাহ কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ মো'মেনদেরকে কীভাবে পরীক্ষা করবেন সেটাও পবিত্র কোর'আনে বলা আছে। তিনি বলেছেন, "এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্য ধারণকারীদের।" (সুরা আল-বাক্বারা ১৫৫)। এখানে বলা হয় নি যে তোমাদের মেয়েদেরকে গণধর্ষণ করা হবে, তারা পেটের জ্বালায় পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য হবে, খাদ্যের বিনিময়ে সন্তানকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হবে। এটাকে পরীক্ষা বলে না, এটা লাঞ্ছনা, অবমাননা। অতীতে ইহুদি জাতিকে এমন পরিণতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল যারা তাদের পথভ্রষ্টতার দরুন অভিশপ্ত (মাগদুব) হয়েছিল। আল্লাহ তো মো'মেনের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত অবমানিত হওয়া থেকে সুরক্ষা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এরা কেউ ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে উদ্বাস্তু হন নি, নির্যাতনের শিকার হন নি। আল্লাহ তো পরীক্ষা নেবেন তাদের যারা সত্য ধারণ করবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি এবং দেখে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে ও কারা তাতে অটল ছিল। (সুরা মুহাম্মদ- ৩১)।

বর্তমানের প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তু হওয়ার আগে পশ্চিমা জীবনব্যবস্থারই অনুসারী ছিল। যারা বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের আগ্রাসনের শিকার হয়ে করুণ মৃত্যুবরণ করেছে, যারা আহত হয়েছে তারাও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের চেয়ে পশ্চিমা প্রভু রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বেরই পূজারী ছিল, ঠিক বাংলাদেশের মুসলমান নামধারীদের মতই। সিরিয়ার শাসক বাশার আল আসাদ, লিবিয়ার গাদ্দাফি, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন প্রত্যেকেই ছিল সমাজতন্ত্রপন্থী এক নায়ক। এসব দেশে নাগরিকরা শিয়া-সুন্নি বিরোধ করে নিজেরাই নিজেদের রক্তে দেশের মাটি লাল করে রেখেছে শত শত বছর ধরে। আল্লাহ ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন কোর'আনে আর রসুল বারবার জাতিকে সাবধান করে বলেছিলেন যে, তোমরা ঐক্য

নষ্ট করে, দীন নিয়ে মতভেদ করে, একে অপরকে হত্যা করে ঐক্য নষ্ট করো না। আত্মকলহে ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি অভিশপ্ত জাতির লক্ষণ। আল্লাহই বলেছেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, পরস্পরে কলহে লিপ্ত হবে না। অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হবে (সুরা আনফাল ৪৬)। সুতরাং তাদের নাগরিকদেরকে রসুলের সাহাবীদের সাথে তুলনা হাস্যকর অন্ধত্ব।

বর্তমানের এই ১৬০ কোটি মুসলিম নামধারী জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারা যাদেরকে আল্লাহর রসুল বলেছেন ভেসে যাওয়া আবর্জনা। রসুলাল্লাহ (দ.) একদিন বললেন- "শীঘ্রই এমন দিন আসছে যে অন্যান্য জাতিসমূহ এই উম্মাহর বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকবে যেমন করে (খানা পরিবেশন করার পর) একে অন্য সবাইকে খেতে ডাকে।"

তাকে প্রশ্ন করা হলো "আমরা কি তখন সংখ্যায় এত নগণ্য থাকব?"

তিনি বললেন, "না, তখন তোমরা সংখ্যায় অগণ্য হবে, কিন্তু হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুর মন থেকে তোমাদের সম্পর্কে ভয়-ভীতি উঠিয়ে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে দুর্বলতা নিক্ষেপ করবেন।"

কেউ প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রসুল! এই দুর্বলতার কারণ কি হবে?" তিনি জবাব দিলেন, "দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও মৃত্যুর প্রতি অনীহা।" [হাদীস- সাওবান (রা.) থেকে আবু দাউদ মেশকাত।]

যারা সমাজের অন্যায়, অবিচার দেখেও তা বন্ধ করার জন্য সংগ্রাম না করে নীরবতা পালন করে, সে আস্তিক বা নাস্তিক, আলেম বা মূর্খ, মুত্তাকী বা বেপরোয়া, নামাজি বা বে-নামাজি যা-ই হোক না কেন, সে আল্লাহর দৃষ্টিতে অপরাধী, ক্রিমিনাল, মুজরিম। আল্লাহ মো'মেনদের রিপুজনিত দোষ-ত্রুটি গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অসংখ্যবার। এই মো'মেন হচ্ছে তারা, যারা সমাজে অন্যায় হতে দেন নি, অন্যায় প্রতিরোধ করছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে আমাদের সমাজের পরহেজগার ব্যক্তিরা নামাজ, রোজা ইত্যাদির দ্বারা পুণ্য সংগ্রহ করে তা নিয়ে হাশরের দিন পার পেতে চায়, কারণ এগুলোকেই তারা আমল মনে করেন। কিন্তু সমাজে বিরাজিত অন্যায়কে প্রতিহত করার কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। **তাই সুদখোর মহাজন বা কোনো রাজনীতিক দলের সন্ত্রাসী হয় মসজিদ কমিটির পরিচালক। অনাহারী, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের আর্ত চিৎকারে বাতাস ভারি হয়ে উঠলেও কথিত ধার্মিকেরা মাথা নিচু করে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে ছোটেন, রোজা রাখেন, হজ্ব করেন।**

আল্লাহ বলছেন, "আমি কি তোমাদের এমন লোকদের কথা বলব, যারা আমলের দিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত? এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা এ দুনিয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে মনে ভাবছে, তারা ভালো কাজই করে যাচ্ছে (সুরা কাহাফ: ১০৩-১০৪)।" আদ-সামুদ ইত্যাদি জাতিগুলোকে আল্লাহ যখন

ধ্বংস করলেন তখন তাদের মধ্যে কি পরহেজগার লোক ছিলেন না? অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু তাদের পরহেজগারির তোয়াক্কা আল্লাহ করেন নি।

তিনি বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী।" (সুরা হুদ ১১৬)। আমরা যদি সিরিয়া, ইরাকের ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুসলমানদের দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখব যে তারাও ছিল যার যার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়ি-গাড়ি, উন্নত জীবন মানের পেছনে ছুটতেই ব্যস্ত ছিল।

এখনো মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ভোগ বিলাসে মত্ত হতেই উদগ্রীব। আর যারা আলেম, জ্ঞানী তারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে মৌন। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে চান না। এগুলোকে তারা দুনিয়াবী কাজ বলে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু এভাবে অন্ধ হলেই তারা প্রলয় এড়াতে পারবেন না। তারা প্রাকৃতিক বিধান যদি নাও বোঝেন রসুলাল্লাহর সাবধানবাণী অবশ্যই বুঝবেন। তিনি বলে গেছেন, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কিছু লোক যদি অন্যায় কাজ সংঘটিত করে এবং সেটা পরিবর্তন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যরা যদি সেটা না করে তাহলে আল্লাহ তাদের সবার উপরে আযাব নাযিল করেন [হাইসাম (রা.) থেকে আহমদ]।

অর্পিত দায়িত্ব পালন না করার শাস্তি

উম্মতে মোহাম্মদীকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত শৃঙ্খলা বা জীবনশৈলী সমস্ত পৃথিবীর মানবজাতির জীবনে প্রচলন করার জন্য, প্রতিষ্ঠা করার জন্য। একটি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ঐ জাতিকে অবশ্যই সংগ্রামী হতে হবে, প্রয়োজনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত করতে হবে এটা স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ জেহাদ বা সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে মো'মেনদের জন্য ফরদ, আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। এটা এমন এক ফরদ যা করার জন্যই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই সংগ্রাম না করলে, সংগ্রাম ত্যাগ করলে জাতি সৃষ্টির কোনো অর্থই থাকে না। কারণ তাহলে আল্লাহ যে জন্য এই দীন প্রেরণ করেছেন সেই দীন মানবজীবনে প্রতিষ্ঠাও হবে না, পৃথিবীতে শান্তিও আসবে না।

এখন যারা এই সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করবে আল্লাহ তাদের জন্য শাস্তির ঘোষণা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে বের না হও তাহলে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের উপরে অন্য জাতি চাপিয়ে দেবেন (সুরা তওবা ৩৯)।" এখানে লক্ষণীয় যে আল্লাহ বলছেন কঠিন শাস্তি দেবেন, এর অর্থই হচ্ছে তারা আর মো'মেন নেই। মো'মেনদের তো কঠিন শাস্তি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে একবারও কোথাও বলেন নি যে তিনি মো'মেনদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন। মো'মেনদের প্রতি হাজারো অভয়বাণী, সুসংবাদ, ক্ষমা, জান্নাত ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোর'আন পূর্ণ। আর

কঠিন শাস্তির ঘোষণা তিনি দিয়েছেন কেবল কাফেরদের জন্য। এরপরে তিনি বলছেন তোমাদের উপর অন্য জাতি চাপিয়ে দেবেন অর্থাৎ অন্যের গোলাম বানিয়ে দেবেন। সেই সূত্রে মুসলিম জাতি গত কয়েক শ বছর পরাধীন গোলামের জীবন যাপন করছে।

আংশিক ইসলাম মান্য করলে শাস্তি

পাশাপাশি যারা নিজেদের জীবনে আল্লাহর বিধানের যেটুকু পছন্দ হয় ততটুকু পালন করবে আর বাকিটা প্রত্যাখ্যান করবে বা ধর্মের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি পালন করতে গিয়ে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবতাকে বিপর্যস্ত করে দেবে তাদের জন্যও আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে শাস্তি ও পরকালের জাহান্নামের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমারা কি আমার কেতাবের কিছু অংশ মান্য করবে আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করবে? এই যদি তোমাদের অভিপ্রায় হয় তাহলে এর পরিণাম পার্থিব জীবনে অপমান লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী হতে পারে? শুধু তাই নয়- পরকালে তোমাদেরকে আরো কঠিন শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (সুরা বাকারা ৮৫)।

লা'নতের প্রকারভেদ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোর'আনে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, এমন কি ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের জন্য লা'নত অর্থাৎ অভিশাপ দিয়েছেন। তার অভিশাপ মানেই নির্মম শাস্তি। আল্লাহ, যার চেয়ে বড় ক্ষমাশীল নেই, যার চেয়ে বড় দয়াশীল নেই, যার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি বার বার ক্ষমার আশ্বাস দিয়েছেন, সেই তিনিই যখন অভিশাপ দেন তখন নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সেই ব্যক্তি বা গোত্র বা গোষ্ঠী বা জাতি ক্ষমার যোগ্যতা ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গেছে, সেই গফুরুর রাহীমেরও ক্ষমার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। কোর'আনে দেখা যায় তিনি বিভিন্নভাবে, প্রধানত তিন ভাবে লা'নত দিয়েছেন।

১। তিনি শুধু নিজে দিয়েছেন।

২। অন্যের মুখ দিয়ে দিয়েছেন।

৩। তিনি তাঁর মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতা ও মানব জাতি সম্মিলিতভাবে লা'নত দিয়েছেন।

উদাহরণ- শুধু তার একার লা'নত তিনি দিচ্ছেন তাদের, যুদ্ধ করতে বললে যারা ভয়ে মুর্ছিত, মৃতপ্রায় হয়ে যায় (সুরা মোহাম্মদ ২৩, ২৪), কাফেরদের (সুরা-আহাযাব ৬৪), মোনাফেকদের (সুরা আল আহ্যাব ৬০, ৬১), যালেমদের (অন্যায়কারীদের) (সুরা হুদ ১৮) ইত্যাদি।

অন্যের মুখ দিয়ে লা'নত তিনি দিচ্ছেন বনি ইসরাইলের কাফেরদের। একবার দাউদ (আ.) কে দিয়ে আরেকবার ঈসা (আ.) কে দিয়ে (সুরা আল মায়েদা ৮১)।

আর তিনি, তাঁর মালায়েক ও মানব জাতির সম্মিলিত লা'নত দিচ্ছেন দু'বার। একবার দিচ্ছেন সেই সব কাফেরদের যারা মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর দীনকে অস্বীকার

করে কাফের অবস্থাই মারা গেলো। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলছেন- তারা (জাহান্নামে) চিরদিন থাকবে। তাদের শাস্তি কমানোও হবে না, বিরতিও দেয়া হবে না (সুরা বাকারা ১৬১, ১৬২)। আরেকবার দিচ্ছেন তাদের, যারা একবার সত্য গ্রহণ করার পর কুফরে (অবিশ্বাসে) ফিরে গেছে (সুরা আল-মায়েদা ৮৬, ৮৯)।

পূর্বের লানতপ্রাপ্ত জাতিগুলোর পার্থিব পরিণতিঃ

আল্লাহর একার দেয়া লা'নত, অন্যের মুখ দিয়ে দেয়া লা'নত আর আল্লাহ, তার মালায়েক ও মানব জাতির সম্মিলিত লা'নত; এই তিন রকমের লা'নতের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর লা'নত হচ্ছে ঐ সম্মিলিত লা'নত সন্দেহ নেই। অন্যের মুখ দিয়ে তিনি যে দু'বার বনি ইসরাইল অর্থাৎ ইহুদি জাতিকে লা'নত দিলেন তার পরিণাম দেখলেই বোঝা যাবে যে সম্মিলিত লা'নত কত ভয়ংকর হবে। ইহুদি জাতির উপর প্রথম লা'নত তিনি দিলেন দাউদের (আ.) মুখ দিয়ে। ফল হলো এই যে, ব্যাবিলোনের রাজা (নবুশ্যাড্‌নেযার/বখত নসর) ইহুদিদের আক্রমণ করে পরাজিত করলো। ব্যাবিলোনীয় সৈন্যরা তাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তাদের হত্যা করলো, বাকি সমস্ত লোকজনকে বন্দী করে সমস্ত জাতিটাকে ক্রীতদাসে পরিণত করে তাদের স্বদেশ ব্যাবিলোনে নিয়ে গেল, ইহুদিদের ডেভিড মন্দির (Temple of David) ধ্বংস করে দিলো। এ শাস্তি আল্লাহ দিলেন খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৫৮৬ সনে। সম্পূর্ণ জাতিটি ব্যাবিলোনে বহু বছর ক্রীতদাসের জীবন যাপনের পর আল্লাহর দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি তাদের আবার সিরিয়ায় ফিরিয়ে এনে তাদের উপর দয়া করলেন। ইহুদিরা আবার ধনে-জনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো, তারা তাদের ডেভিড মন্দির পুনঃনির্মাণ করলো।

তারপর যখন তারা আবার বিপথগামী হলো তখন আল্লাহ পাঠালেন তার নবী ঈসাকে (আ.)। ঈসা (আ.) এসে বনি ইসরাইলীদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন থেকে বিরত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তখন তার মুখ দিয়ে আল্লাহ তাদের দ্বিতীয় বার লা'নত দিলেন। এই দ্বিতীয় লা'নতের ফলে ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান টিটাস ইহুদিদের আক্রমণ করে তাদের পাইকারীভাবে হত্যা করলো, তাদের মেয়েদের নিয়ে গেলো, ধন-সম্পত্তি সব লুটে নিলো, ইহুদিদের ডেভিড মন্দির (Temple of David) সহ তাদের রাজধানী যেরুজালেম শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলো এবং তারপর সমস্ত সিরিয়া থেকে সমস্ত জাতিটাকে সমূলে উচ্ছেদ করে দিলো। হাজার হাজার বছরের বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়ে ইহুদিরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিল। সেই ৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার বছর এই ইহুদি জাতির ইতিহাস কি? তাদের ইতিহাস হচ্ছে এই যে আল্লাহর লা'নতের ফলে ইউরোপের যে দেশেই তারা আশ্রয় নিয়েছে, বসতি স্থাপন করেছে, সেই দেশের সমস্ত মানুষ তাদের অবজ্ঞা করছে, ঘৃণা করেছে। আমরা শুকর যেমন ঘৃণা করি- তেমনি ঘৃণা করেছে। শুধু ঘৃণা করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি। মাঝে মাঝেই ইউরোপের খ্রিষ্টানরা দলবদ্ধ হয়ে ইহুদিদের বসতি আক্রমণ করে তাদের পুরুষদের হত্যা করে মেয়েদের বেঁধে নিয়ে গেছে, সম্পত্তি লুটপাট করে বাড়ি-ঘর

আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই কাজটা ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা প্রতিটি ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রে এতবার করেছে যে ইউরোপীয় ভাষায় একে বোঝাবার জন্য একটি নতুন শব্দেরই সৃষ্টি হয়েছে। সেটা Pogrom, যার আভিধানিক অর্থ হলো Organized Killing and Plunder of a Community of People, বাংলায় "সুসংগঠিত ভাবে সম্প্রদায় বিশেষকে হত্যা ও লুণ্ঠন।" দু'হাজার বছর ধোরে অভিশপ্ত ইহুদিদের উপর ঐ Pogrom চালাবার পর শেষ Pogrom আল্লাহ করালেন হিটলারকে দিয়ে। তাকে দিয়ে তিনি ইউরোপের ইহুদিদের উপর চরম অত্যাচার করালেন ও তাদের ছয় মিলিয়ন অর্থাৎ ৬০ লক্ষ ইহুদিদের হত্যা করালেন। এ হিসাবটা অবশ্য ইহুদিদের করা সুতরাং বাড়াবাড়ি হতে পারে, কিন্তু হিটলারের হাতে যে লক্ষ লক্ষ ইহুদি মারা গেছে তা ঐতিহাসিক সত্য। দাউদের (আ.) মুখ দিয়ে লা'নত অর্থাৎ অভিশাপ দেয়ার ফল হিসাবে নেবুশ্যাড্‌নেয়ার (বখতনসর) কে দিয়ে ডেভিড মন্দির ধ্বংস করে সমস্ত ইহুদি জাতিটাকে বন্দী করে ব্যাবিলোনে নিয়ে যেয়ে সেখানে শত শত বছর দাসত্বের জীবন কাটানোর পর যেমন আল্লাহ জাতিটার উপর থেকে লা'নত উঠিয়ে নিয়েছিলেন, তেমনি ঈসার (আ.) মুখ দিয়ে লা'নত দেবার ফল হিসাবে রোমান টিটাসকে দিয়ে ইহুদিদের পুনঃনির্মিত ডেভিড মন্দিরসহ এবার সম্পূর্ণ যেরুযালেম শহরটাই ধ্বংস করে দিয়ে ইহুদি জাতিটাকেই তাদের জন্মভূমি থেকে একেবারে উচ্ছেদ করে ইউরোপীয়দের দিয়ে তাদের উপর দু'হাজার বছর ধোরে অবজ্ঞা, ঘৃণা আর Pogrom করিয়ে মনে হয় এখন আল্লাহ তাদের উপর থেকে লা'নত উঠিয়ে নিয়েছেন। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তাদের উপর আর Pogrom হচ্ছে না এবং তারা বর্তমানে একটি শক্তিশালী ও সম্মানিত জাতি।

মুসলিমঃ বর্তমানে যারা লানতপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী

এখন মুসলিম বলে পরিচিত জাতিটির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে আল্লাহ লা'নত দিলে কোনো জাতির যে দশা হয়, এই জাতির দশা ঠিক তাই। সিরিয়া থেকে ইহুদিরা যে ভাবে উৎখাত হয়েছিল, স্পেন থেকে ঠিক তেমনিভাবে উৎখাত হয়েছে। সমস্ত ইউরোপে ইহুদি জাতি যেমন ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হয়েছে, মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতি সমস্ত পৃথিবীময় তেমনি ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, অপমানিত হচ্ছে। তফাৎ এই যে ইহুদিদের শাস্তি ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আর এই জাতির উপর শাস্তি সমস্ত পৃথিবীময়। এর কারণ আছে; ইহুদি জাতি একটি ছোট জাতি, এই জাতির মধ্যে আল্লাহর যে নবী প্রেরিত হয়েছিলেন তার দায়িত্বও ছিল সীমাবদ্ধ, শুধু ইহুদি জাতির মধ্যে, কাজেই অভিশপ্ত অর্থাৎ মালাউন হবার পর তার শাস্তিও ছিল ইউরোপের মধ্যে সীমিত। আর মুসলিম বলে পরিচিত জাতিটি যিনি গঠন করেন সেই বিশ্বনবী (দ.) প্রেরিত হয়েছেন সমস্ত পৃথিবীর জন্য, সম্পূর্ণ মানব জাতির জন্য। তাই তার জাতির শাস্তি ও পুরস্কার দু'টোই পৃথিবীময়, কোথাও সীমিত নয়।

ইউরোপের যে যে রাষ্ট্রে ইহুদিরা বসতি স্থাপন করেছিলো সেই সেই রাষ্ট্রের লোকেরা তাদের উপর Pogrom করেছে। এই মুসলিম জাতি পৃথিবীর যেখানেই আছে সেই

দেশের মানুষ দিয়ে অত্যাচারিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে। খ্রিষ্টানদের হাতের কাছে যেখানে মুসলিম আছে সেখানে খ্রিষ্টানদের দিয়ে, (বসনিয়া-হারজেগোভিনা, সুদান, ফিলিপাইন, ইথিওপিয়া) ইহুদিদের দিয়ে (পশ্চিম এশিয়া প্যালেস্টাইন), বৌদ্ধদের দিয়ে (চীন, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কমপুচিয়া ভিয়েতনাম) হিন্দুদের দিয়ে (সমস্ত ভারত ও কাশ্মীর)। অর্থাৎ পাঁচটি প্রধান ধর্মের চারটিকে দিয়েই পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম নামের এই জাতিটাকে পেষা হচ্ছে। আর সে পেষা কেমন পেষা? তাদের গুলি করে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে, ট্যাঙ্ক দিয়ে পিষে হত্যা করা হচ্ছে, তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া, তাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যেয়ে ধর্ষণ করা হচ্ছে, ধর্ষণের পর হত্যা করা হচ্ছে, ইউরোপের ও অন্যান্য স্থানের বেশ্যালয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। পুরুষরা পর্যন্ত দেহব্যবসায় নিয়োজিত হচ্ছে। বসনিয়ায় খ্রিষ্টান সার্বরা যা করেছে তার নজির মানুষের ইতিহাসে নেই। খ্রিষ্টান সার্বরা দুই লক্ষ মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করেছে, তাদের সাত মাস পর্যন্ত আটকে রেখেছে যাতে তারা খ্রিষ্টানদের ঔরসজাত সন্তানগুলো গর্ভপাত করে ফেলে দিতে না পারে। অভিশপ্ত হওয়ার পর ইহুদিদেরও আল্লাহ এমন শাস্তি দেন নাই। পৃথিবীর বড় বড় জাতিগুলো দিয়ে শাস্তি দিয়েও খুশি না হয়ে আল্লাহ অপমানের চূড়ান্ত করার জন্য ভারতের আসামের গাছ-পাথর উপাসক একটি পাহাড়ী উপজাতি দিয়ে মুসলিম নামধারী এই জাতিকে গুলি করে, তীর দিয়ে, কুপিয়ে হত্যা করাচ্ছেন, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে উচ্ছেদ করাচ্ছেন। এ যদি আল্লাহর লা'নতের ফল না হয় তবে লা'নত কাকে বলে?

কেন এই লা'নত? যে জাতিকে আল্লাহ বলেছেন তোমরা যদি মো'মেন হও তবে পৃথিবীর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে দেব এবং সত্যই সেই ছোট্ট জাতির হাতে তাই দিয়েছিলেন। বর্তমান মুসলিম জাতির হাতে পৃথিবীর প্রভুত্ব তো দূরের কথা, এ জাতি আজ পৃথিবীর অন্য প্রত্যেক জাতি দিয়ে অপমানিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত, এক কথায় নিকৃষ্টতম জাতি। **আল্লাহর লা'নতের প্রতিটি ছাপ আজ এই জাতির দেহে চিহ্নিত। অথচ এই জাতি সেই মো'মেন হবার দাবিদার।** আমরা মো'মেন অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রসুলে বিশ্বাসী হলে আল্লাহ মিথ্যা বলেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। **কেন এই লা'নত? এর জবাব হচ্ছে এই, আল্লাহ বলেছেন যারা আল্লাহ ও রসুলের উপর ঈমান এনে তারপর কুফরে প্রত্যাবর্তন করছে তাদের উপর আল্লাহ, আল্লাহর মালায়েকদের ও মানব জাতির সম্মিলিত লা'নত (অভিশাপ) (সুরা আল ইমরান ৮৬-৮৯)।**

এই দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওহীদের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি সর্ববিষয়ে বিশেষ করে সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে ও বিশ্বাস করে নেয়া এবং সমস্ত পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। প্রমাণ, আল্লাহ বলছেন- মো'মেন শুধু তারা যারা আল্লাহ ও তার রসুলকে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর বিধান ছাড়া আর কাউকে মানে না) তারপর তা থেকে বিচ্যুত হয় না এবং নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে (তা প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ মানবতার কল্যাণে

সংগ্রাম করে (সুরা হুজরাত ১৫)। অর্থাৎ মো'মেন হবার জন্য আল্লাহ দু'টি শর্ত ও সংজ্ঞা দিচ্ছেন। একটা জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার অর্থাৎ তওহীদ এবং দ্বিতীয়টি সেই তওহীদকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই দু'টোর যে কোন একটা বাদ গেলেই সে বা তারা আর মো'মেন নয়। সারারাত তাহাজ্জুদ পড়লেও নয়, সারা বছর রোজা রাখলেও নয়। মুসলিম হবার দাবিদার এই জাতি বহু শতাব্দী আগেই তওহীদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছেড়ে দিয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক (সুরা তওবা ৩৮, ৩৯) এই জাতিকে খ্রিষ্টান জাতিগুলোর দাসে পরিণত করে দিয়েছেন। এ তওহীদকে (আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব) সার্বিক জীবন থেকে প্রত্যাখ্যান করে সমষ্টিগত জীবনে খ্রিষ্টান, ইহুদিদের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে শুধু ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করায় অর্থাৎ শেরক ও কুফরে ফিরে যাওয়ায় এই জাতিকে লা'নত দিয়েছেন। তাই মালাউন (অভিশপ্ত) ইহুদি জাতির উপর যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তার চেয়েও বেশি শাস্তি হচ্ছে এই মুসলিম নামধারী জাতিটির উপর। কারণ ইহুদি জাতিকে আল্লাহ লা'নত দিয়েছিলেন, তা দিয়েছিলেন তিনি একা এবং অন্যের মুখ দিয়ে আর আমাদের লা'নত তিনি দিয়েছেন তার অসংখ্য মালায়েক এবং মানব জাতিকে সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিতভাবে।

আমরা জানি বর্তমানের মুসলিম নামধারী জাতিটাকে যে জাতি হেদায়েতহীন তাকওয়া নিয়ে অতি ব্যস্ত আছে, তাকে আল্লাহ তাঁর মালায়েক আর মানব জাতি দ্বারা অভিশপ্ত বললে সেটা কেমন চটে যাবে। তারা যদি না মানেন তবে আমাদের অনুরোধ তারা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন যে অভিশপ্ত ইহুদিদের চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি আমাদের কেন হচ্ছে। আল্লাহর লা'নতের নির্মম শাস্তি সত্ত্বেও এই জাতি তওবা করে তওহীদে সেরাতুল মোস্তাকীমে, দীনুল কাইয়্যেমায়, জেহাদে ফিরে না এসে নির্বোধের মত নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও হাজার রকমের নফল এবাদত ও তাকওয়া করে যাচ্ছে আর ভাবছে তাদের জন্য জান্নাতের দরজায় লাল কার্পেট বিছিয়ে রাখা হয়েছে। লা'নতের অন্যতম শাস্তি বোধশক্তির লোপ, তাই এত সওয়াবের কাজের পরও এত নির্মম শাস্তি কেন তা বুঝে আসে না। এ ব্যাপারে আমার মনে একটা উদাহরণ ভেসে ওঠে। মনে করুন একটি লোক বহু কষ্টে টাকা-পয়সা খরচ করে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে একটি দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ যোগাড় করে এনে বাগানে লাগালো ও অতি যত্নের সাথে পরিচর্যা করতে লাগলো। সে অধীর আগ্রহে দিন গুনতে লাগলো- কবে সেই গাছে অপূর্ব সেই ফুলটি ফুটবে। অনেক যত্ন, পরিচর্যার পর অনেক দিন পর ফুল গাছে অতি বিচিত্র ফুলটি এলো। অনেক লোক সেই আশ্চর্য ফুল দেখতে এলো। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকটি দেখলো তার গরু সে ফুলটাকে খেয়ে ফেলেছে। রাগে, দুঃখে পাগল হয়ে সে গরুটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে লাঠি নিয়ে মারতে লাগলো। মারতে মারতে সে গরুটার মাথা ফাটিয়ে দিলো, পা গুলো ভেঙ্গে ফেললো, গরুর গায়ের চামড়া ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। কিন্তু গরুটা কি বুঝতে পারবে কেন তাকে অমন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? পারবে না। বর্তমানের এই মুসলিম জাতিও তার নির্মম শাস্তির কারণ বুঝতে পারছে না।

তারা সারা দুনিয়ায় সবার কাছে মার খাচ্ছে, ঘৃণিত হচ্ছে। বর্তমানে সাড়ে ছয় কোটি মুসলিম উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে। তাদের সারা শরীরে লানতের চিহ্ন। এই অবস্থায় তাদের একটা কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে তাদের কোনো ব্যক্তিগত আমল, পোশাক আশাক, খুটিনাটি মাসলা মাসায়েল মেনে চলা, তাদের টাখনুর উপরে পাজামা পরা, তাদের বিশুদ্ধ ওজু, আরবীয় জোব্বা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, পর্দা সব নিরর্থক। এখন তাদের একটাই ধর্ম, সেটা হচ্ছে এই হীনতার জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করা। **কবি নজরুল বলেছিলেন, "কিসের ধর্ম? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙ্গে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙ্গাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মত মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই বোন বাপ মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি? দু'বেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যেই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি? মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি?"**

মুসলিম কর্তৃক রসুলাল্লাহর অপমানকর অবমূল্যায়নঃ

বিশ্বনবীর (দ.) প্রবর্তিত ইসলাম যে মুসলিম উৎপাদন করেছিল সে মুসলিমের আকীদা এই ছিল যে, তাদের নেতা আল্লাহর রসুলের (দ.) জীবনের উদ্দেশ্য ছিল তাদের জীবন ও পার্থিব যা কিছু আছে সবকিছুকে উৎসর্গ করে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। বাস্তবেও তিনি মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন। অজ্ঞতা, কূপমণ্ডুকতা, দরিদ্রতায় নিমজ্জিত, অন্যান্য সভ্য জাতিগুলো দ্বারা অবজ্ঞাত-উপেক্ষিত, পারস্পরিক দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত আরবদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুশৃঙ্খল, সমৃদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় শ্রেষ্ঠ, অর্থনৈতিক-সামরিক শক্তিতে অদ্বিতীয় পরাশক্তিতে পরিণত করেছিলেন। আর আজ যে ইসলাম চলছে তা যে মুসলিম উৎপাদন করে তাদের আকীদা হলো এই যে আল্লাহর প্রেরিত নবী রসুলদের নেতা, তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যার কোনো তুলনা নেই, সেই রসুলাল্লাহকে পাঠানো হয়েছিল মানুষকে টাখনুর উপর পাজামা পরার মত, মাথায় টুপি দেবার মত, দাড়ি রাখানোর মত, দাঁত মাজার মত, কুলুখ নেয়ার মত, ডান পাশে শোয়ার মত তুচ্ছ ব্যাপার শেখাতে। **মানুষের ইতিহাসে বোধহয় কোনো জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন করে নি।** কাহ্হার (রুদ্র, কঠোর) আল্লাহও তাঁর শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম রসুলের (দ.) এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ছাড়েন নি। তিনি ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টান জাতিগুলো দিয়ে এদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান দিয়ে হত্যা করিয়েছেন, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, জীবন্ত কবর দিয়ে, পুড়িয়ে, ট্যাংকের তলে পিষে মেরেছেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুরাও বাদ যায় নি।

এদের মেয়েদের ইউরোপের আফ্রিকার বেশ্যালয়ে বিক্রি করিয়েছেন এবং তারপর মাত্র চারটি ছোট দেশ বাদে মরক্কো, থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত এই বিশাল এলাকার সমস্তটুকুর রাষ্ট্রশক্তি এদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইউরোপিয়ান জাতিগুলোর হাতে

দিয়ে তাদের দাস বানিয়ে দিয়েছেন এবং তারা এদের সর্বস্ব লুণ্ঠণ ও শোষণ করে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নামিয়ে দিয়েছে, গৃহপালিত পশুর মত এদের নিজেদের কাজে লাগিয়েছে, তাদের জুতা পরিষ্কার করিয়েছে। এই লাঞ্ছনা এখনও চলছে, আর জাতির ধর্মনেতারা এখনও সুর করে মিলাদ পড়ে, ওয়াজ করে, দাওয়াত খেয়ে বেড়াচ্ছেন আর ভাবছেন তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তারা আম্বিয়াদের ওয়ারিশ, পরকালে তাদের জন্য জান্নাতের দুয়ারে লাল গালিচা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। লা'নত আর কাকে বলে? নির্বুদ্ধিতা আর কাকে বলে?

এখন এই কথাটি মুসলিম দাবিদার সমগ্র জনগোষ্ঠী যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারে তত তাড়াতাড়ি রক্ষা পাবে, নয়তো পুরো জনগোষ্ঠী একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে কি আলাদা রাখা সম্ভব?

কিছুদিন আগে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোতে একজন আলোচক বললেন, "ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে। ধর্ম থাকবে মনের ভেতরে এবং মসজিদের মত পবিত্র জায়গায়। তাই রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে ধর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে। তাহলেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।"

রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে মুক্ত করার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ যদি গড়া যায় তাতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। আমিও চাই এমন একটি সমাজ, এমন একটি জাতি, যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, ঘৃণা ও বিদ্বেষের চর্চা হবে না। সকল ধর্মের মানুষ সম-অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বেঁচে থাকবে। কিন্তু একটি বিষয় আমার বুঝে আসে না ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা হবে কীভাবে?

সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা প্রথম গৃহীত হয় ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে। আর আমাদের উপমহাদেশে তা আমদানি হয় ঔপনিবেশিক আমলে, ইংরেজদের মাধ্যমে। **সেই ষোড়শ শতাব্দী থেকে আজকের দিনটি পর্যন্ত রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক রাখার প্রচেষ্টা কিন্তু কম হয় নি। মনে করা হয়েছিল রাষ্ট্রটা ধর্মমুক্ত করে ফেলতে পারলেই ধর্ম কোণঠাসা হয়ে পড়বে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে। তারপর সময়ের সাথে সাথে পুরোপুরি হারিয়ে যাবে। তা যে হয় নি, বরং বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোই যে কোনঠাসা অবস্থায় উপনীত হয়েছে, আর ধর্ম রূপ নিয়েছে পৃথিবীর এক নম্বর ইস্যুতে তা বলাই বাহুল্য।** আজকে ইউরোপের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ধর্ম ইস্যুতে উন্মাতাল। জ্বলছে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ক্ষমতায় বসেছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। আর যে আমেরিকা সারা বিশ্বের মানুষকে মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতার ছবক দিয়ে বেড়াত, সে দেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা এখন বড় অনুঘটকে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ গত চারশ' বছরের প্রচেষ্টা কার্যত নিষ্ফল হয়েছে এ কথা বলাই যায়। এর কারণ কী?

আসলে সেক্যুলারিজমের তত্ত্ব সফল করতে হলে মানুষকে পুরোপুরি ধর্মহীন করে ফেলতে হবে। কিন্তু মানুষকে ধর্মহীন করার প্রচেষ্টা সফল হবার নয়। কারণ দেহ-আত্মার সমন্বয়ে মানুষ। দেহের চাহিদা পূরণ করাই তাই যথেষ্ট নয়, তার আত্মিক চাহিদাও পূরণীয়। যুগ যুগ ধরে মানুষের এই আত্মিক চাহিদা পূরণ করে আসছে ধর্ম। আমাদের ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। এখানকার মানুষের রক্তের কণিকায় মিশে আছে ধর্মবিশ্বাস। তাদের চিন্তা-চেতনা ধর্মকেন্দ্রিক। তারা উপোস থেকে দিনের পর দিন কাটাতে পারে, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ছাড়তে পারে না। এখানকার সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, প্রথা-পরম্পরা, ইতিহাস-ঐতিহ্য সবকিছুর সাথে ওতোপ্রোতভাবে ধর্ম জড়িয়ে আছে। প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে তারা ধর্মের অনুশাসন মেনে অভ্যস্ত। পাশ্চাত্যের মানুষগুলোর মত তারা পার্থিব উন্নতিকেই জীবনের একমাত্র সফলতা মনে করে না। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই তাদের শেষ কথা নয়। পাশ্চাত্যের গর্বের বিষয় যদি হয় আধুনিক প্রযুক্তি, প্রাচ্যের গর্বের বিষয় তাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ধর্মাদর্শ। তাদের কাছে দুনিয়ার চেয়ে পরকাল দামী। তারা স্রষ্টার সান্নিধ্য চায়, আত্মার পরিতৃপ্তি চায়। ধর্ম তাদের এই চাহিদা পূরণ করে, আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি দান করে। এ কারণে কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মবিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরে নি। উল্টো সেক্যুলারিজমের হালে পানি নেই আজ।

রাষ্ট্র চালায় জনপ্রতিনিধিরা। আর জনপ্রনিধি নির্বাচন করে ভোটাররা। ভোটার কারা? ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলোই হচ্ছে ভোটার। সেই ভোটারদেরকে মই হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাবার স্বপ্ন দেখে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো। মানুষের ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা হয়। একই ধর্মনিরপেক্ষ সিস্টেমের অধীনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ও নির্বাচনে অংশ নেওয়া সত্ত্বেও ধর্মভিত্তিক দলগুলো খাঁটি মো'মেন বনে যায়, আর অন্যান্য দলগুলোকে বলা হয় কাফের। তারা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর মতই হরতাল, অবরোধ, জ্বালাও, পোড়াও, ভাঙচুর করে তার নাম দেন জিহাদ, আর ভোটযুদ্ধের ব্যালট পেপারকে বলেন জান্নাতের টিকিট। অর্থাৎ যে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পরিত্যাগ করে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল তা আর ব্যক্তিগত জীবনে থাকল না। রাষ্ট্র যখন ধর্মকে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দিল, সেটাকে লুফে নিল ধর্মব্যবসায়ীরা। রাষ্ট্র যখন মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক খাতে কাজে লাগাল না, ধর্মব্যবসায়ীরা তখন সেটাকে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের মাধ্যম বানিয়ে নিল। মানুষ ধর্মের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। মানুষের ঈমান এক বড় শক্তি। সেই মহাশক্তিটি উঠে গেল একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর হাতে। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে, নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরেছে, সবকিছুর ঘুড়ির নাটাই ছিল এই গোষ্ঠী। **তারা বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তেজনার পারদ চড়ায়, ধর্ম গেল ধর্ম গেল জিগির তুলে মানুষকে উন্মাদনায় মাতায়, জ্বালাও-পোড়াও-ভাঙচুর করে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তবু রাষ্ট্র তাদেরকে তোয়াজ করে চলতে বাধ্য হয় কারণ ঐ ঈমান নামক মহাশক্তি তাদের হাতে। তাহলে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে পারল কি?**

আবার যারা সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী বলে নিজেদের দাবি করেন তাদেরকে কিন্তু দিনশেষে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের কাছেই যেতে হয়। মানুষের নার্ভ বুঝতে হয়। জনগণকে বোঝাতে হয় আমরা ধর্মের বিপক্ষের শক্তি নই, আমরাও ধর্ম মানি। এই দ্যাখো আমরা নামাজ পড়ছি, হজ্বে যাচ্ছি, ইজতেমার মুনাজাতে অংশ নিচ্ছি, পীরের মাজারে যাচ্ছি, কোর'আন তেলাওয়াত করছি ইত্যাদি। নেতার ধর্মকর্মের ছবি প্রচার করেন কর্মীরা। ধর্মবিশ্বাসী মানুষের সাথে ধার্মিকতার এই অভিনয় না করলে তারা ভোট পাবেন না। কারণ তাদের বিরুদ্ধে ধর্মভিত্তিক দলগুলো তো কাফের, নাস্তিক ফতোয়া দিয়েই রেখেছে। এই ফতোয়ার আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা কেউ রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন, কেউ সংবিধানে আল্লাহর নাম লেখেন, কেউ মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। সেক্যুলার রাজনৈতিক দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতারা মসজিদ-মাদ্রাসা-মন্দির কমিটির সভাপতি হন, সদস্য হন। তাহলে রাষ্ট্রকে ধর্মের বাইরে রাখা গেল কি?

সত্য হচ্ছে- রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা যায় নি, যাবেও না। মাঝখান থেকে সাধারণ মানুষ কেবল প্রতারিত হচ্ছে। প্রতারিত হচ্ছে ধর্মভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয়পক্ষের কাছেই। এই প্রতারণার ইতি টানতে হবে এখন। মানুষকে ব্যাপকভাবে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে। তাদের ঈমানকে আর ভুল খাতে প্রবাহিত হতে দেওয়া যাবে না। ঈমান নামক মহাশক্তিকে ফেলে রাখা উচিত হবে না। মানুষের ঈমানকে আর খাটো করে দেখার অবকাশ নেই, অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। ঈমানকেও রাষ্ট্রের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে।

ধর্ম এসেছে মানুষের কল্যাণের জন্য। যারা ধর্মকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইত্যাদি স্বার্থ হাসিল করে, অকল্যাণ ঘটায়, মানবতার ক্ষতি করে তারা যে ধর্মের পক্ষশক্তি নয় সেটা সাধারণ মানুষের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে। মানুষ আল্লাহর খলিফা। আল্লাহ যেমন সারা সৃষ্টিজগতকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করেন, মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে তেমনি শান্তিপূর্ণভাবে পৃথিবীকে পরিচালনা করা। এটাই মানুষের এবাদত। কাজেই যে কাজে, যে কথায়, যে আচরণে, যে সিদ্ধান্তে সমাজের শান্তি নষ্ট হয়, মানবতা ক্ষতিগ্রস্থ হয় সে কাজ ইসলামের কাজ হতে পারে না- এই বোধ সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। এইযে এতকিছু করতে হবে, এই দায়িত্ব কিন্তু রাষ্ট্রেরই। আমরা হেযবুত তওহীদ আমাদের সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করছি মানুষকে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দিতে। এখন রাষ্ট্রকেও এগিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্র যদি এখনও ধর্মকে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে রাখে তাহলে রাষ্ট্রেরও ক্ষতি ধর্মেরও ক্ষতি। আর যদি ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে ধর্মবিশ্বাসী জনগণকে যাবতীয় ন্যায় ও সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে তাহলে রাষ্ট্রেরও লাভ, ধর্মেরও লাভ। তখন রাষ্ট্রকে আর ধর্মবিশ্বাসী মানুষ নিয়ে চিন্তিত থাকতে হবে না, ধর্মবিশ্বাসী মানুষও রাষ্ট্রকে শত্রু মনে করবে না। রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়েরই লক্ষ্য হবে মানবতার কল্যাণ।